স্বস্তিকা

দাম : দশ টাকা

দেশের অখণ্ডতা
রক্ষা করতে গিয়ে
প্রাণ দিয়েছিলেন
শ্যামাপ্রসাদ — পৃঃ ১১

শ্যামাপ্রসাদ
মৃত্যুরহস্যের
উদ্‌ঘাটন খুবই
জরুরি—পৃঃ ৩১

৬৯ বর্ষ, ৪৩ সংখ্যা ।। ৩ জুলাই ২০১৭ ।। ১৮ আষাঢ় - ১৪২৪ ।। যুগাব্দ ৫১১৯ ।। শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ সংখ্যা ।। website : www.eswastika.com ।।

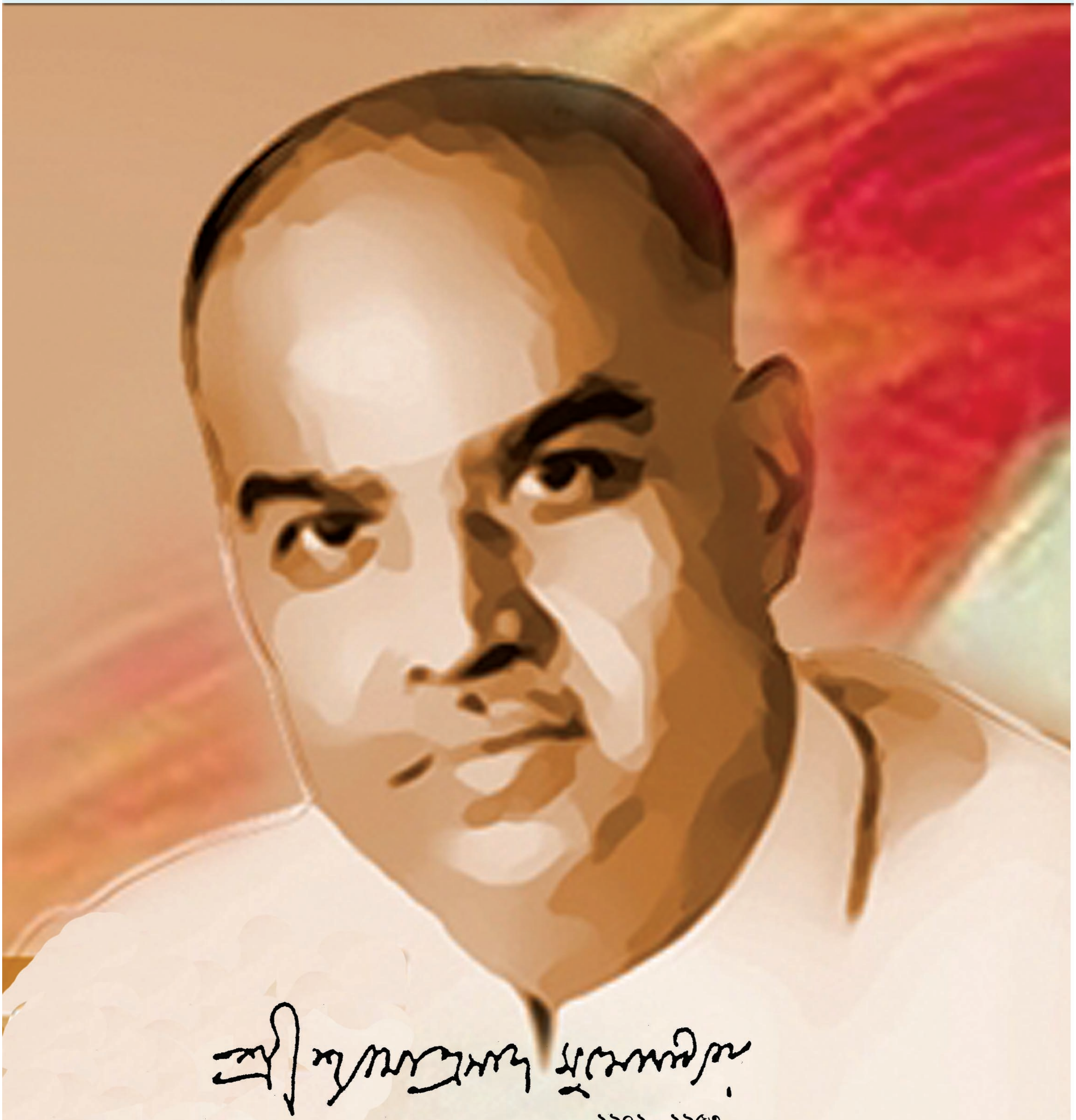

১৯০১ - ১৯৫৩

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

।। শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ সংখ্যা।।

৬৯ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা, ১৮ আষাঢ়, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

৩ জুলাই - ২০১৭, যুগাব্দ - ৫১১৯,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড ভারতের কল্পনা আদৌ স্বপ্নবিলাস নয়
▯ ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ▯ ৬

শ্যামাপ্রসাদকে যেমন দেখেছি ▯ ৯

দেশের অখণ্ডতা রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ ▯ রন্তিদেব সেনগুপ্ত ▯ ১১

শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন রাজনৈতিক হিন্দু
▯ মোহিত রায় ▯ ১৫

স্বাধীন ভারতের প্রথম শিল্পমন্ত্রী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী
▯ প্রণব দত্ত মজুমদার ▯ ১৯

নজরুল-দরদি শ্যামাপ্রসাদ
▯ অভিজিৎ দাশগুপ্ত ▯ ২৩

তাহাতে নাম লিখিও 'ড. শ্যামাপ্রসাদ'
▯ ড. জিষ্ণু বসু ▯ ২৮

শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুরহস্যের উদ্‌ঘাটন খুবই জরুরি
▯ অর্ণব কুমার ব্যানার্জী ▯ ৩১

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে শ্যামাপ্রসাদের মতো রাজনৈতিক নেতার খুবই প্রয়োজন ▯ মানস ঘোষ ▯ ৩৭

গুজরাটিদের কাছে 'চতুর বানিয়া' সম্বোধন আদৌ অপমানজনক নয় ▯ আকর প্যাটেল ▯ ৩৯

দার্জিলিং পাহাড়কে ভারত-বিরোধী আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র করা হচ্ছে ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ৪৩

খোলাচিঠি : কালো মোদী, সাদা টাকা ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৪৫

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

আগামী ১৭ জুলাই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। স্বস্তিকার ১০ জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত হবে স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জানা-অজানা নানা দিক নিয়ে একাধিক রচনা। লিখবেন চন্দ্রভানু ঘোষাল, ড. তুষার কান্তি ঘোষ প্রমুখ।

বেঙ্গল
সামুই
ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই

ব্যবহার করুন

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

শাহী
গরম
মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সন্ত্রাসের বীভৎস রূপ

গত এক বছর ধরিয়া কাশ্মীর উপত্যকা ক্রমাগত সন্ত্রাস ও হিংসার আগুনে জ্বলিতেছে। কয়েকদিন আগে জামিয়া মসজিদের বাহিরে রাজ্য পুলিশের ডিএসপি আয়ুব পণ্ডিতকে কুপাইয়া হত্যা করা হইয়াছে। বস্তুত উপত্যকায় নিরাপত্তারক্ষীদের উপর সন্ত্রাসীদের হামলা একটা সাধারণ ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দুই-একদিন অন্তরই সেনা অথবা সুরক্ষাবলের কোনো না কোনো কেন্দ্রে সন্ত্রাসবাদীরা আক্রমণ করিতেছে। এই কথা সত্য যে, কিছুদিন হইল সেনা ও সুরক্ষাবল সন্ত্রাসবাদীদের কঠোরভাবে মোকাবিলা করিতেছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ফল লক্ষ্য করা যাইতেছে না। সীমান্তে পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা কিছুটা হ্রাস পাইয়াছে বটে, কিন্তু জওয়ানদের লক্ষ্য করিয়া পাক-হামলার ঘটনা ক্রমশ বাড়িতেছে। সম্প্রতি নিয়ন্ত্রণ রেখা অতিক্রম করিয়া পাকিস্তানি বর্ডার অ্যাকশন টিম (ব্যাট) দুই সেনা জওয়ানকে হত্যা করিয়াছে। এই আক্রমণের প্রত্যুত্তরে এই দলের এক সন্ত্রাসবাদীও নিহত হইয়াছে। তাহাদের নিকট হইতে একটি ক্যামেরা উদ্ধার করা হইয়াছে, যাহাতে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা রেকর্ড করা যায়। ইহা এক অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজ। আজকের যুগে এইরকম বর্বর ও বীভৎস চিন্তা— কেহ কাহাকে নৃশংসভাবে হত্যা করিতেছে আর তাহা রেকর্ড করা হইতেছে, কল্পনা করাও কঠিন। কিন্তু প্রাপ্ত তথ্যে জানা যাইতেছে, পাক-সেনার সহযোগেই তথাকথিত বর্ডার অ্যাকশন টিম এমন নৃশংস হত্যা করিতেছে। আসলে এই টিম জঙ্গি ও পাক-সেনাদের যৌথ ষড়যন্ত্রে গঠিত। শ্রীনগরের মসজিদের বাহিরে জম্মু-কাশ্মীরের ডিএসপি আয়ুব পণ্ডিতকে যেভাবে পিটাইয়া হত্যা করা হইয়াছে তাহাতে ব্যাট-এর নৃশংস মানসিকতারই প্রতিফলন লক্ষ্য করা যাইতেছে।

বিশ্বের অন্যান্য দেশেও সন্ত্রাসবাদীদের হামলা হইতেছে, কিন্তু কাশ্মীর উপত্যকায় যে বর্বরতা ও জেহাদি উন্মত্ততার সহিত সন্ত্রাসবাদীরা হামলা করিতেছে, তাহা কেবল আই এস আই-এর ক্রুরতার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ইহাতে মনে হইতে পারে, এই রকম নৃশংসতার সঙ্গেই সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবিলা করিতে হইবে। সন্ত্রাসবাদীদের নিঃশেষ এইভাবেই সম্ভব। আরও একটি প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে— জম্মু-কাশ্মীরের পুলিশের সঙ্গে সেখানে মোতায়েন সেনা ও সুরক্ষাবলের আরও অধিকারী ও সরঞ্জাম বাড়াইতে হইবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাহা দেখা যাইতেছে না। আরও একটি প্রশ্ন সঙ্গতভাবেই উঠিয়াছে যে পাক-সমর্থক বিচ্ছিন্নতাবাদী ঘোর ভারত-বিরোধী নেতাদের এখনও কেন সরকারি সুরক্ষা দেওয়া হইতেছে। আজ পরিস্থিতি এমন এক জায়গায় পৌঁছাইয়াছে যে এই ছদ্ম-যুদ্ধ বীভৎস রূপে প্রকাশ্য যুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। তাই কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদীদের নিঃশেষ করিয়া দেওয়া হইবে বা পাকিস্তানকে যথোচিত শিক্ষা দেওয়া হইবে— এই ধরনের সতর্ক বার্তা আর যথেষ্ট নহে। এখন এই বার্তাকে কবে বাস্তবে পরিণত করা হইবে— ইহাই প্রশ্ন। নতুন জোট সরকার ক্ষমতায় আসিবার পর কার্যক্ষেত্রে কোনো গুণগত পরিবর্তন হয় নাই। এই প্রেক্ষাপটে রাজ্য সরকার যদি সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ না করে তবে কাশ্মীর উপত্যকার অবস্থা আরও বেহাল হইবে। ইহার দায়ভার হইতে কখনোই মুখ ফিরাইয়া লইতে পারে না জম্মু-কাশ্মীরের জোট সরকার।

সুভাষিতম্

যস্য পুত্রো ন বিদ্বান্ স্যাৎ ন শূরো ন চ পণ্ডিতঃ।
অন্ধকারং কুলং তস্য নষ্টচন্দ্রের শর্বরী।। (চাণক্য শ্লোক)
—যার পুত্র বিদ্বান, পরাক্রমশালী ও পণ্ডিত নয়, তার বংশ চন্দ্রহীন রজনীর মতোই অন্ধকারময়।

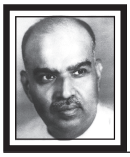

সেদিন শ্যামাপ্রসাদ যা বলেছিলেন—

‘ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড ভারতের কল্পনা আদৌ স্বপ্নবিলাস নয়’

স্বাধীনোত্তর পরিস্থিতিতে কংগ্রেসি রাজনীতির ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গঠন করেন ভারতীয় জনসঙ্ঘ— যা হলো আজকের ভারতীয় জনতা পার্টির পূর্বসূরি। ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রথম সর্বভারতীয় অধিবেশন হয় কানপুরে ১৯৫৩ সালে। তিনদিন ব্যাপী এই অধিবেশনের প্রথম দিনে জনসঙ্ঘ সভাপতি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পাক-ভারত সম্পর্ক প্রসঙ্গে যে ভাষণ দেন, সেটি এখানে পুনর্মুদ্রিত করা হলো। এই ঐতিহাসিক ভাষণের মধ্যে তিনি যে সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গী উপস্থাপিত করেন, আজকের পরিস্থিতিতে তার তাৎপর্য বিচারযোগ্য। —সঃ স্বঃ

আমরা যদি নিজেদের ঘর সামলাতে না পারি এবং দেশ বিভাগের ফলে নিদারুণ বিপর্যস্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনকে সুব্যবস্থিত করতে না পারি, তবে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা কোনোদিনই যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারবো না। স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনী বা গোলা-বারুদ দ্বারা জাতির শক্তি নিরূপিত হয় না, প্রকৃত শক্তির উৎস দেশের জনসাধারণ।

স্বরাজ অর্জনের জন্য কাল্পনিক হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ওপর নির্ভর করে কংগ্রেস মস্ত বড় ভুল করেছে। তার ফলে কংগ্রেসকে জাতীয় স্বার্থের পক্ষে গুরুতর ক্ষতিকর আপোশ রফা করতে বাধ্য করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তোষণ নীতির দ্বারা যে বিভেদ সৃষ্টিকারী মনোভাব দূর করতে চাওয়া হয়েছিল, পরে তাই কুৎসিত পরিণতি লাভ করে। ফলে দেশ বিভক্ত হয়ে যায়। কে শুনেছে যে, যারা ধর্মান্তরিতের বংশধর, তারা ধর্মের ভিত্তিতে দেশ বিভাগের দাবি করতে পারে? আমাদের বিশ্বাস, দেশ বিভাগের ফলে ভারতে অথবা পাকিস্তানে কোথাও সাধারণ লোকের কোনোই উপকার হয়নি।

পূর্ণ অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার সর্বোচ্চ আদর্শ অনুসারে জনসাধারণের মন ও চরিত্রের উন্নতির মধ্যে স্বাভাবিক সমন্বয় সাধনের ভিত্তিতেই ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্ভবপর বলে আমরা বিশ্বাস করি। আমরা যে স্বাধীনতা লাভ করেছি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভিন্ন তা অর্থহীন।

যে জাতি তার অতীত গৌরবে গর্ব অনুভব করতে পারে না এবং তা হতে প্রেরণা লাভে সমর্থ হয় না, সে জাতি কখনও বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গঠন করতে সমর্থ হয় না। দুর্বল জাতি কখনও মহত্ত্ব লাভ করতে পারে না। আমরা ভগবদ্গীতায় প্রচারিত অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী। যে-কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারা যায় আমরা এমন শক্তি ও সামর্থ্য অর্জনের পক্ষপাতী। কিন্তু আমরা দরিদ্র ও দুর্বলের পীড়নের জন্য তা প্রয়োগের সম্পূর্ণ বিরোধী। আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস, সুদূর পল্লী অঞ্চলের যেসব অধিবাসী অধিকাংশ নিরক্ষর, বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহকারী, বিভিন্ন প্রথা ও আচার পদ্ধতি অনুসরণকারী, যতদিন পর্যন্ত তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা না হবে ততদিন ভারতের উন্নতির কোনো আশা নেই। আমরা মনে করি--- ভারতে স্বার্থরক্ষার জন্য শক্তিশালী ও সুবিন্যস্ত কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হওয়ার দরকার। সেই সঙ্গে আমরা অধিকতর বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষপাতী। কেবলমাত্র এই ব্যবস্থার দ্বারাই আমরা স্থায়ী প্রচেষ্টার মাধ্যমে শাসনব্যবস্থার মূল দৃঢ় এবং দায়িত্ব বৃদ্ধি করতে পারব।

দেশ এখন গভীর ব্যর্থতার মনোভাবে জর্জরিত। বর্তমান সরকারের প্রকৃতই কিছু করার অভিপ্রায় আছে কিনা তদ্বিষয়ে জনসাধারণ সন্দিহান। তারা এখন আর প্রতিশ্রুতি ও পরিকল্পনায় ভুলতে রাজি নয়। তারা প্রকৃতই কিছু দেখতে চায়।

বিভাগোত্তর তিনটি সমস্যা

বর্তমান পরিস্থিতিতে দেখা যাচ্ছে যে, দেশ বিভাগের পর তিনটি সমস্যা জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে। সেই সমস্যাগুলি হলো কাশ্মীর, পূর্ববঙ্গ এবং উদ্বাস্তু পুনর্বাসন।

কাশ্মীর সম্বন্ধে আমরা স্পষ্ট করে বলেছি যে, সমগ্র জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য ভারতবর্ষের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর সমস্যা উত্থাপনের মূল কারণ যাই থাকুক না কেন, গত তিন বছরে যেসব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, তাতে নিরাপত্তা পরিষদ হতে কাশ্মীর প্রসঙ্গ প্রত্যাহার করার প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এটা স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে, এই প্রতিষ্ঠানের নিকট ভারত কোনো সুবিধা আশা করতে পারে না। পাকিস্তান কাশ্মীর আক্রমণকারী হলেও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ব্রিটেন ও আমেরিকা-সহ কয়েকটি প্রধান শক্তি ভারতের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষায় সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। কিছুদিন পূর্বে কাশ্মীরে যে গণপরিষদ গঠিত হয়েছে, জম্মুর বিষয় বিবেচনায় তাও প্রতিনিধিত্বমূলক হয়নি বলে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। তাসত্ত্বেও এই পরিষদ ভারতভুক্তির প্রশ্ন সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর দু'টি বিষয় থাকবে—

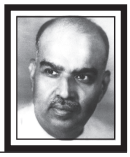

একটি জম্মু-কাশ্মীরে পাকিস্তানের অধিকৃত এলাকার ভবিষ্যৎ এবং আর একটি এই রাজ্যে ভারতীয় সংবিধানের প্রয়োগ সংক্রান্ত প্রশ্ন। প্রথমোক্ত বিষয় সম্বন্ধে বলা যায় যে, জম্মু-কাশ্মীর-সহ ভারতের আত্মসম্মান রক্ষা করতে হলে যে-কোনো উপায়ে শত্রুর কবল হতে ওই অঞ্চলকে উদ্ধার করতে হবে। এই কারণে ভারতকে যে-কোনো পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এইরূপ বলপূর্বক রাজ্যাধিকার ভারত যদি বরদাস্ত করে, তাহলে ভবিষ্যতে আমাদের স্বাধীনতা বিপন্ন হবে।

অন্য বিষয় সম্পর্কে পূর্ববর্তী কয়েকটি বিষয় উপলক্ষে আমরা আমাদের অভিমত সুস্পষ্ট রূপেই উল্লেখ করেছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, জম্মু-কাশ্মীরের ভারতভুক্তি সংক্রান্ত আমাদের পরিকল্পনা প্রকৃত জাতীয়তার ও কাশ্মীর-সহ ভারতের নিরাপত্তার দিক দিয়ে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। শেখ আবদুল্লা ও অন্য সকলে সংবিধান রচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন। এই সংবিধানে সকলের জন্য সমান রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোনো অ-মুসলমানই ভারত হতে স্বতন্ত্রভাবে থাকতে চান না। তবে কেন শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বাধীনে রাজ্যের অধিকাংশ মুসলমান স্বাধীন ভারতে প্রযুক্ত সংবিধান গ্রহণ করতে চান না? এই প্রশ্নের কোনো সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায়নি। আমাদের যুক্তি এই যে, আমাদের সংবিধানে এরূপ বলা হয়েছে যে, দেশ রক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক ও সংযোগ ব্যবস্থা ব্যতীত সংবিধানের অন্যান্য বিধানের প্রয়োগ জম্মু-কাশ্মীর সরকারের সম্মতির ওপর নির্ভর করবে। রাজ্যের তৎকালীন অবস্থার বিষয়ে বিবেচনা করেই শ্রীগোপাল স্বামী আয়েঙ্গার ওই বিশেষ বিধানটি সন্নিবিষ্ট করার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন।

জম্মু ও লাদাখের অধিবাসীরা সম্পূর্ণ রূপে ভারতভুক্তির অনুকূলে মত প্রকাশ করেছেন। কাশ্মীর উপত্যকার অধিবাসীরা যদি ভিন্ন মত প্রকাশ করেন, তবে তাদের জন্য সাময়িকভাবে বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের বলা হয় যে, জম্মু-কাশ্মীরে ভারতীয় সংবিধান প্রয়োগের জন্য চাপ দেওয়া হলে কাশ্মীর উপত্যকার মুসলমানরা ভারতের বিরোধিতা করবে। এই ধরনের যুক্তি মোটেই বোধগম্য হয় না। আমাদের সংবিধান যদি এমনভাবে পরিকল্পিত হয়ে থাকে যে, মুসলমানরা তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আতঙ্কিত হতে পারেন অথবা তাঁরা সমান ব্যবহার পাবেন না বলে সন্দিহান হতে পারেন, তাহলে পূর্বোক্ত যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি হওয়া সম্ভবপর নয়।

পূর্ববঙ্গের পরিস্থিতি সর্বত্র গভীর উদ্বেগ ও উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। পূর্ব পাকিস্তানের এক কোটি হিন্দুকে রক্ষা করার জন্য দেশবাসী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবি জানিয়েছে। দেশ বিভাগের মূল উদ্দেশ্য এই ছিল যে, ভারত ও পাকিস্তানে সংখ্যালঘুরা নিরাপত্তা ও সম্মানের সঙ্গে বাস করতে পারবে। ভারতে এখনও ৪ কোটি মুসলমান বাস করেন। অন্য সংখ্যালঘুদের সংখ্যা অধিক নয়। তবে সংখ্যালঘুরা সকলেই এখানে শান্তিতে বাস করছেন। পশ্চিম পাকিস্তান হতে হিন্দুসংখ্যালঘুরা বিতাড়িত হয়েছেন। ৪০ থেকে ৫০ লক্ষ হিন্দুকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। এই হিন্দু বিতাড়ন পদ্ধতি মধ্যে মধ্যে অনুসৃত হয়। ফলে হিন্দুরা অবর্ণনীয় দুঃখ, দুর্দশা ও নির্যাতন ভোগ করে থাকেন। ছাড়পত্র প্রথা হিন্দু বিদ্বেষ বশত পরিকল্পনানুযায়ী প্রবর্তিত হয়েছে। পূর্ববঙ্গে এখনও যে ৯০ লক্ষ হিন্দু রয়েছেন, তাঁরা যদি ভারতবর্ষে আসতে বাধ্য হন, তাহলে আমাদের দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়বে।

অতএব আমরা একটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছি এবং ঘোষণা করেছি যে, পাকিস্তান যা করছে দেশ বিভাগের মূল শর্ত ভঙ্গ করেই তা করা হচ্ছে। সুতরাং দেশ বিভাগকে নাকচ করতে হবে। গান্ধীজী বলেছিলেন, পাকিস্তান যদি সংখ্যালঘুদের রক্ষা করতে সমর্থ না হয়, তবে ভারতকেই তার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। আমরা অবিলম্বে যুদ্ধ ঘোষণার দাবি করছি না, তবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, আমাদের নিজ সরকারের দুর্বল ও কালহরণের নীতির জন্য পাকিস্তান গভর্নমেন্ট বেপরোয়াভাবে কাজ করতে সাহসী হচ্ছে। সুতরাং আমরা সরকারের নীতির আমূল পরিবর্তনের দাবি জানাচ্ছি। আমরা অবিলম্বে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কার্যকরী ভাবে অর্থনৈতিক অবরোধ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি করছি। আমাদের সরকারের ক্লৈব্য বা উদাসীনতার ফলে জাতির মর্যাদায় ও সম্মানে প্রচণ্ড আঘাত লাগছে। এটা প্রাদেশিক সমস্যা নয়, এটা একটি জাতীয় সমস্যা। উভয় সরকারের মধ্যে এর বোঝাপড়া হওয়া আবশ্যক। সরকারকে এই বিষয়ে সচেতন করার জন্য জনমত গঠন করা অত্যাবশ্যক। হিন্দু রক্ষা, অর্থনৈতিক ব্যাপার, সীমান্ত রক্ষা এবং কাশ্মীর সমস্যা যে বিষয়েরই উল্লেখ করা যাক না কেন, আমরা প্রতি পদেই পাকিস্তানের নিকট অপদস্থ হচ্ছি। আমাদের সরকার অসহায় দর্শকের মতো নিষ্ক্রিয়। তারা কোনো কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে সমর্থ হচ্ছে না। উদ্বাস্তু পুনর্বাসনও একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সমস্যা। আমরা এই বিষয় বিবেচনার জন্য একটি নিরপেক্ষ কমিশন গঠনের দাবি করছি। যেসব উদ্বাস্তু পশ্চিম পাকিস্তানে বিষয় সম্পত্তি ফেলে এসেছেন, তাঁদের ক্ষতিপূরণ দানের বিষয় সরকার কিছুকাল যাবৎ চিন্তা করছে। এই বিষয়ে পরীক্ষামূলক তদন্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের সময় অনেকদিন অতীত হয়েছে। উদ্বাস্তুদের ঋণদান সমস্যা নানারূপ দুঃখ কষ্টের কারণ হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর হতেও বহু উদ্বাস্তু দিল্লি ও আশেপাশের রাজ্য এসে বাস করছেন। ওই সকল রাজ্যে পুনর্বাসনের কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি। ওই রাজ্য হতে প্রায় ৫ সহস্র হিন্দু রমণী পাকিস্তানি হানাদারদের দ্বারা অপহৃত হয়। তাঁদের উদ্ধারের জন্য এ পর্যন্ত কিছুই করা হয়নি। এইরূপ প্রত্যেকটি সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব সরকারকে এবং সমানভাবে ভারতের জনসাধারণকে গ্রহণ করতে হবে। ■

প্রিটোনিয়া প্রকাশিত নতুন বইয়ের সম্ভার

পরিমলকান্তি ভট্টাচার্য
মন ক্যামেরা
₹ ২০০

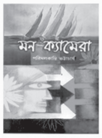

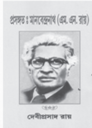

দেবীপ্রসাদ রায়
প্রসঙ্গতঃ মানবেন্দ্রনাথ (এম.এন.রায়)
₹ ২০০

ড. সিসিলা দে সরকার (বসু)
কথা সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু
₹ ২৫০

সুনীল দাস
চারটি রহস্য উপন্যাস
₹ ২০০

প্রদীপ ঘোষ
লোকসংস্কৃতির বিপন্নতা ও অন্যান্য
₹ ১৫০

হরিবংশ রাই বচ্চন
অনুবাদ : সুমিতা ভৌমিক
মধুশালা
₹ ১০০

নির্মল ঘোষ
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংশয়ে ও স্বপ্নে
₹ ১৫০

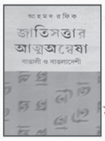

আহমদ রফিক
জাতিসত্তার আত্মঅন্বেষা
বাঙালী ও বাঙলাদেশী
₹ ২০০

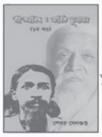

শেখর সেনগুপ্ত
শ্রী অরবিন্দ : সার্বিক মূল্যায়ণ
(১ম খণ্ড) ₹ ২৫০

আহমদ রফিক
এই অস্থির সময়
₹ ১৭৫

ড. মনিমোহন ভট্টাচার্য
স্বামীজী পুত্র নেতাজী
(১ম খণ্ড) ₹ ৩৫০

শেখর সেনগুপ্ত
পঞ্চ ঋষির রমণীচক্র
₹ ২৫০

Dr. Subhrendu Bhattacharjya
Affinity between Blake's Views And Indian Philosophy
INR : 500

ড. বিজয় আঢ্য
পুরাণের পৃষ্ঠা থেকে
₹ ২০০

বিপ্লব মজুমদারের
রণিদা রহস্য ট্রিলজি
₹ ২৫০

সৌরকুমার বসু
শান্তিনিকেতন ও নকশাল আন্দোলন
₹ ২০০

সাতটি রহস্য উপন্যাস
₹ ৩৫০

কথামৃতসার
(শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত অবলম্বনে)
সংকলক জীবনীকার
মণি বাগচি
₹ ২০০

অর্পা
একটি মননশীল পত্রিকা
● আপনার মূল্যবান লেখাটি পাঠান মনোনীত হলে আমরা প্রকাশ করব।
সম্পাদক : প্রদীপ ঘোষ ●যোগাযোগ : 9831145588

প্রিটোনিয়া
১৪ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯ ফোন : ২২৪১ ২১০৯, ৬৪৫৪-২১০৯
email : publishers.pritonia2015@gmail.com
visit : www.pritoniapublishers.com

দেশপ্রেমিক মাত্রেরই অবশ্যপাঠ্য

'সেভ ইণ্ডিয়া মিশন' কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত

'কাশ্মীর সমস্যা ও জওহরলাল নেহরু প্রথম কাশ্মীর যুদ্ধ'

মূল্য ৩০্ টাকা

লেখক : **নিত্যরঞ্জন দাস**।। ভূমিকা — **অমিতাভ ঘোষ**

প্রাপ্তিস্থান : বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭২
সেভ ইণ্ডিয়া মিশন, বি.ই. ৩০০, সল্টলেক, কলকাতা-৬৪

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার ডিজাইনের ক্যাটালগ
সুপার

যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

ALWAYS EXCLUSIVE
NR **Vandana** ®
SAREES ● SUITS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees
Contact No. : 033-22188744 / 1386

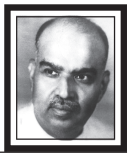

শ্যামাপ্রসাদকে যেমন দেখেছি

অটলবিহারী বাজপেয়ী

ড. মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গুণ ছিল তাঁর অলৌকিক দূরদর্শিতার মধ্যে। তৎকালে যেসব ব্যক্তি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁদের অনেকের পূর্বেই ড. মুখোপাধ্যায় যে-কোনো বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা করে নিতে পারতেন। বিভিন্ন জাতীয় ঘটনার ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্পর্কে তিনি যা যা বলেছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে সঠিক বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। দেশবিভাগের সময় ঘটনাপ্রবাহে তিনি যখন দেখলেন যে সমগ্র পঞ্জাব ও বাংলাকে পাকিস্তানের হাতে সমর্পণ করা হচ্ছে, তখন তিনি দাবি তুললেন, যে নীতিতে ভারতবর্ষকে ভাগ করা হচ্ছে, সেই একই নীতিতে বাংলা ও পঞ্জাবকে ভাগ করা হোক। তাঁর একক প্রচেষ্টাতেই বাংলা ও পঞ্জাবের কিছু অংশ ভারতের হাতে রয়ে গেল। কংগ্রেসিরা এক সময়ে তাঁকে দেশ বিভাগকারী বলে অভিযুক্ত করেছিল। শ্যামাপ্রসাদ এ অভিযোগের উত্তরে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, আপনারা ভারত ভাগ করে পাকিস্তান তৈরি করেছেন, আমি পাকিস্তান ভাগ করে পূর্ব পঞ্জাব এবং পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করেছি।' চীনারা তিব্বত অধিকার করলে তিনি ভারতের সন্নিকটে চীনা অস্তিত্বের বিপদ সম্পর্কে নেহরুকে অবহিত করেছিলেন। কিন্তু নেহরুজী সমেত তদানীন্তন নেতারা শ্যামাপ্রসাদের কথায় কোনোরূপ গুরুত্ব দেননি। কাশ্মীরের জন্য পৃথক সংবিধান ও পৃথক পতাকার যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, ড. মুখোপাধ্যায় দৃঢ় কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আবদুল্লা কি ক্রন্দনরত শিশু যে তাঁকে খেলনা হিসাবে নিজস্ব পতাকা দিয়ে ভোলাবার চেষ্টা করা হচ্ছে? নেহরুর অন্তরঙ্গ সুহৃদ শেখ আবদুল্লার কৌশলী ও বক্র মনোভাব সম্পর্কে তিনি প্রথম থেকেই সবাইকে সজাগ হতে বলেছিলেন। কিন্তু তাঁর এ কথাতেও কেউ কর্ণপাত করেনি। অদ্বিতীয় সংসদ সদস্যরূপে সংসদের তিনি ছিলেন চিন্তাশীল প্রতিনিধি। তাঁর ভাষণ শোনার জন্য সকলে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ অপেক্ষা করে থাকতেন। সংসদ কক্ষের দর্শকাসন ভর্তি হয়ে যেত এবং অনেক শ্রোতা স্থানের অভাবে বিষণ্ণ মনে ফিরে যেতেন। তাঁর ভাষণের রিপোর্ট নেবার জন্য সাংবাদিকরা কফির পেয়ালা ছেড়ে দ্রুত সংসদ কক্ষে হাজির হতেন। সংসদে কিছু কংগ্রেস সদস্য ছিলেন, যাঁরা সংসদীয় বিতর্ক সম্পর্কে উদাসীন থাকতেন, তাঁরা নিজ দলের নেতাদের ভাষণ অনেক সময় শুনতেন না, কিন্তু ড. মুখোপাধ্যায়ের অতুলনীয় বাগ্মিতায় মুগ্ধ হয়ে অতিরিক্ত মনোযোগ সহকারে ভাষণ শুনতেন। দেশের পরিস্থিতি ও ঘটনাবলী সম্পর্কে ড. মুখোপাধ্যায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করতেন। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে, নানা তথ্যের সমাবেশের মাধ্যমে তিনি তাঁর বক্তব্য পেশ করতেন। গুরুগম্ভীর স্বরে ও প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত বক্তব্যে অসাধারণ বাগ্মিতার পরিচয় রেখেছেন। এই অননুকরণীয় বাগ্মিতার জন্য তাঁকে চার্চিলের পর কমনওয়েলথের শ্রেষ্ঠ পার্লামেন্টারিয়ান রূপে বর্ণনা করা হোত। সংসদে তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতাগুলি অভূতপূর্ব গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা ও দূরদর্শিতার দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

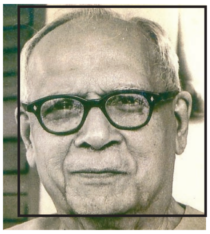

সুন্দর সিংহ ভাণ্ডারী

লিয়াকত আলির নেতৃত্বাধীন পূর্ব-বাংলায় সংখ্যালঘু হিন্দু সমাজের ওপর যে নির্যাতন, ধর্মান্তরকরণ, লুঠতরাজ প্রভৃতি অমানুষিক অত্যাচার চালানো হয়েছিল তাতে ড. শ্যামাপ্রসাদ নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করেছিলেন। পূর্ববঙ্গের হিন্দু নির্যাতনের সংবাদে পণ্ডিত নেহরুও উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু লিয়াকত আলির সঙ্গে বৈঠকে বসে এক সরকারি ঘোষণার মাধ্যমেই নেহরুজী তাঁর কর্তব্য শেষ করেন।

পাকিস্তান কর্তৃক ঘোষিত আশ্বাসবাণীতেই নেহরুজী সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। পাকিস্তানের এই আশ্বাসবাণীর আন্তরিকতা সম্পর্কে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। কারণ পূর্বেও পাকিস্তানের অনেক সদিচ্ছার কথা কথাই থেকে গিয়েছে। বাস্তবে তার প্রকাশ ঘটেনি। ড. শ্যামাপ্রসাদ পাকিস্তানি সদিচ্ছার কথায় আশ্বস্ত হতে পারেননি। পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থেমে গিয়ে অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে আসছে বলে যে সরকারি ঘোষণা প্রকাশ করা হয়েছিল তাতেও তিনি বিশ্বাস রাখতে পারেননি।

নেহরুর নিকট ড. শ্যামাপ্রসাদের চ্যালেঞ্জ :

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নেহরুজীকে বলেছিলেন যে, নয়াদিল্লির শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে পাকিস্তানে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার কথা ঘোষণা করা এবং নিজের সুরক্ষিত নিভৃত আরাম গৃহ থেকে পূর্ব-পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের স্বগৃহে ফিরে যাবার উপদেশ দেওয়া খুবই সহজ। তিনি চ্যালেঞ্জের সুরে নেহরুজীকে ক্ষতিগ্রস্ত ও সর্বহারা ব্যক্তিবর্গের মতো সপরিবারে সেখানে গিয়ে অনুরূপ মন্তব্য করতে অনুরোধ করেন।

এই চ্যালেঞ্জ অবশ্য গ্রহণ করা হয়নি এবং এর জবাবও দেওয়া হয়নি। তিনি পরবর্তী সময়ে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সমাজকে সম্পূর্ণ ধ্বংস থেকে রক্ষা করার জন্য নেহরুজীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। নেহরুজী এর উত্তরে জানিয়েছিলেন যে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের জন্য কিছু করতে তিনি অক্ষম। কারণ পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুরা পাকিস্তানি নাগরিক এবং পাকিস্তান এক পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র। একথা শুনে ড. মুখোপাধ্যায় হতাশ হয়ে বলেছিলেন যে, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে তিনি

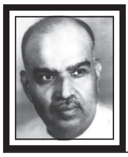

কোনো কিছু করতে অপারগ। যাদের আত্মত্যাগের মূল্যে তিনি দিল্লির মসনদে বসে আছেন এবং ৪০ কোটি জনসংখ্যা বিশিষ্ট দেশের ভাগ্যনিয়ন্তা হয়েছেন সেই হতভাগ্যদের রক্ষা করতে তিনি অক্ষম।

মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন কিন্তু গণতান্ত্রিক আদর্শ ত্যাগ করেননি :

পূর্ববঙ্গে সেদিন যে নিষ্ঠুর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, সে সম্পর্কে ড. মুখোপাধ্যায় সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিলেন। তিনি বলেছেন, পারস্পরিক এই বোঝাপড়ার মাধ্যমেই দেশ ভাগ করা হয়েছিল যে, উভয় দেশেরই সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে যথোপযুক্তভাবে রক্ষা করা হবে। সুতরাং পাকিস্তান যখন এই নৈতিক দায়িত্ব পালন করতে অক্ষম হয়েছে, তখন দেশবিভাগের যুক্তিসঙ্গত ভিত্তিই ব্যর্থ হয়েছে। সুতরাং দেশবিভাগকে বাতিল ও না-মঞ্জুর করে নিজেদের আত্মীয় স্বজনকে রক্ষা করার জন্য ভারত সরকারের উচিত পূর্ববঙ্গে সেনাবাহিনী পাঠানো।

পরবর্তী ঘটনা ড. মুখোপাধ্যায়ের ভবিষ্যতবাণীর সত্যতাই প্রমাণিত করেছিল এবং পণ্ডিত নেহরুর আশা অবান্তর বলে প্রতিপন্ন হয়েছিল। পূর্ববঙ্গের বাস্তব অবস্থার সঠিক মূল্যায়নে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু নেহরু প্রভাবিত সরকার তাঁর ডাকে সাড়া দেননি। কংগ্রেসি সরকারের অকৃতজ্ঞতায় এবং শোচনীয় দুরবস্থায় তিনি অশেষ মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করেছিলেন। কিন্তু এই অন্যায় অবিচারকে তিনি মেনে নিতে পারেননি। ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির আধার মন্ত্রিত্বের পদ তিনি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেন।

ড. মুখোপাধ্যায় এই নিঃসঙ্গ অবস্থাতে রাজনৈতিক সন্ন্যাস গ্রহণ করার কথা ভাবেননি। গণতান্ত্রিক পন্থা অনুসরণ করেই তিনি এই অন্যায় ও অবিচারের প্রতিরোধ করার উপায় চিন্তা করেছেন। তিনি দেশে এক শক্তিশালী বিরোধী দল সংগঠন করেন— যার মূল দেশের মাটির গভীরে প্রোথিত। তার নাম ভারতীয় জনসঙ্ঘ।

শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর পর পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অতুল্য ঘোষ নেহরুর কাছে নিম্নলিখিত চিঠি লিখেছিলেন

২০ জুন, ১৯৫৩
নং ডব্লউ সি. সি/৪/২৩৭৮

প্রিয় পণ্ডিতজী,

আমি আমার ধারণামতো প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কয়েকজন সদস্যের মনোভাব উপস্থাপন করছি।

বর্তমান সময় পর্যন্ত যে বিবরণ হস্তগত হয়েছে, তাতে আমরা দেখতে পাই পরলোকগত ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর গুরুতর অসুস্থতার কথা গত ২২ তারিখ সকালে কাশ্মীর সরকারের কর্তৃপক্ষ জানতে পেরেছিলেন। এটি আশ্চর্যজনক ব্যাপার তাঁর পরিবারের লোকজন অথবা তাঁর চিকিৎসক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনোরূপ সংবাদ পাননি। এরদ্বারা কাশ্মীর সরকারের অপদার্থতা প্রমাণিত হয়।

একটি টেলিফোন সংবাদ বিচারপতি রমাপ্রসাদ মুখার্জীর নিকট পাঠানো হয়েছিল এবং সে সংবাদটি ছিল ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী মারা গিয়েছেন। অন্য কোনোরূপ সংবাদ পাঠানো হয়নি এবং এ বিষয়ে কোনোরূপ বুলেটিনও প্রকাশ করা হয়নি। এতে মনে হয় যে তাঁর বৃদ্ধা মাতার সম্পর্কে কোনোরূপ বিবেচনা করা হয়নি। আপনি জানেন পরলোকগত ড. মুখার্জী খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন এবং সারা ভারতের কথা যদি নাও ধরা হয়— তিনি আমাদের প্রদেশে অত্যন্ত সম্মানীয় ছিলেন।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণাদি দেখে আমার মনে হয় যে তাঁর চিকিৎসার জন্য কোনো সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়নি। তাঁর পুত্র ও কন্যারা তাঁর এই অন্তরীণ অবস্থায় গুরুতর অসুস্থতার কোনো সংবাদ পাননি। তাঁর পরিবারের কাউকে তাঁকে দেখে আসার জন্য কোনো অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়নি। আমাদের রাজ্যের জনমত অত্যন্ত প্রবল আকার ধারণ করেছে। আমি আপনাকে কোনো পরামর্শ দিতে চাই না। কিন্তু আমি বেসরকারি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা যেমন নাকি ডাঃ জয়াকর বা শ্রীকুঞ্জরু অথবা একজন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি দ্বারা কিছু বিষয়ের তদন্ত করানোর কথা ভাবি, এতে আমাদের সাহায্যই করা হবে। আমি এই পত্রের একখানা প্রতিলিপি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নিকট পাঠাচ্ছি।

আপনার বিশ্বস্ত,
অতুল্য ঘোষ

ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার

স্বাধীনচিত্ত লোকের অভাব যে দেশে, সেখানে গণতন্ত্র টিকতে পারে না। ভারতবর্ষে গণতন্ত্র বিঘ্নিত হয়েছে। তার কারণ সরকারের কাজের সমালোচনা করে অপ্রিয় সত্য কথা বলার মতো লোক বেশি মেলেনি। শাসকেরা সেজন্য গণতন্ত্রের নামে স্বৈরতন্ত্র চালিয়ে গেছেন।

প্যাটেল ও শ্যামাপ্রসাদ—এই দুজনেই নেহরুর নির্ভীক সমালোচক ছিলেন। এঁরা দুজনেই গত হবার পরে ভারতের রাজনীতিতে নেহরুর একচ্ছত্র আধিপত্য চলে। নেহরুর অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও একটি বিরাট দোষ ছিল— পরমত অসহিষ্ণুতা। তিনি নিজে যা ভাল মনে করতেন দেশের উপর তা চাপাবার চেষ্টা করতেন। শ্যামাপ্রসাদ একক ভাবে তাঁর স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন। সেজন্য বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁর কথা বারবার মনে পড়ে। তিনি চলে যাবার পর এই রাজ্যে আর কোনো সমতুল্য নেতৃত্ব তৈরি হয়নি।

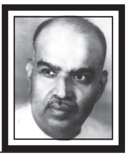

দেশের অখণ্ডতা রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

১৯৫৩ সালের ২৩ জুন কাশ্মীরে বন্দিদশায় প্রয়াত হন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সেই সময়কার সামগ্রিক পরিস্থিতি বিচার করলে এবং পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী খতিয়ে দেখলে এটুকু নিঃসংশয়েই বলা যায় যে, কাশ্মীরে বন্দিদশায় শ্যামাপ্রসাদকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছিল। শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর পর তাঁর মাতা যোগমায়া দেবী এই মৃত্যু রহস্যের তদন্ত দাবি করে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর কাছে চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু নেহরু তাঁর মন্ত্রীসভার এই প্রাক্তন সহকর্মী এবং জাতীয় রাজনীতিতে তাঁর প্রধানতম প্রতিদ্বন্দ্বীর মৃত্যুরহস্যের তদন্ত করতে রাজি ছিলেন না। ফলে শ্যামাপ্রসাদের বিধবা মাতার কাতর আবেদনে সাড়াই দেননি নেহরু। যোগমায়াদেবী ছাড়াও শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথসহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর তদন্ত দাবি করেছিলেন। আসলে, সকলেই বুঝতে পেরেছিলেন শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু স্বাভাবিক ছিল না। তা ছিল রহস্যে ঘেরা। এবং শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর পিছনে কাশ্মীরে শেখ আবদুল্লাহর নেতৃত্বাধীন সরকারের ভূমিকাও ছিল সন্দেহজনক। দুর্ভাগ্যের যে, মৃত্যুর এতবছর পরও সেই রহস্য উদ্ঘাটনের কোনো সরকারি প্রচেষ্টাই চোখে পড়ল না। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে বাদ দিলে শ্যামাপ্রসাদ হচ্ছেন দ্বিতীয় বাঙালি ব্যক্তিত্ব যিনি জাতীয় রাজনীতিতে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী এবং জওহরলাল নেহরুর ঘরানার বাইরে নিজের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। তাঁর পরে আর কোনো বাঙালি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সেই স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষযাত্রার মতোই কলকাতায় শ্যামাপ্রসাদের শেষযাত্রাতেও লক্ষ লক্ষ মানুষের ঢল নেমেছিল। এই শোকযাত্রায় যোগ দেওয়ার জন্য দূর দূরান্ত থেকে অনেক মানুষ এসে কলকাতার রাস্তায় রাত কাটিয়েছিলেন। শ্যামাপ্রসাদের মরদেহ কাশ্মীর থেকে কলকাতায় এসে পৌঁছনোর পর বহু এলাকায়, বহু গৃহে অরন্ধন পালিত হয়েছিল। আসলে শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন বাঙালির হৃদয়ের মুকুটহীন সম্রাট। বাঙালির হৃদয়ে তাঁর পরে আজ পর্যন্ত এই স্থানটি কেউ দখল করতে পারেনি।

কাশ্মীরে শেখ আবদুল্লাহর কারাগারে শ্যামাপ্রসাদকে প্রাণ দিতে হয়েছিল কেন? কেননা, শ্যামাপ্রসাদ হচ্ছেন একমাত্র ব্যক্তি, যিনি কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদের বীজকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে চেয়েছিলেন। শ্যামাপ্রসাদই সেই ব্যক্তি, যিনি শেখ আবদুল্লাহর বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতি এবং নেহরুর দূরদৃষ্টিহীনতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে ভারতের অখণ্ডতা রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। সেই সময়ের কাশ্মীরের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটিতে একবার চোখ বোলালেই বোঝা যাবে— ১৯৪৭ সালের ২৬ অক্টোবর কাশ্মীর রাজ্যটি ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার সময় থেকেই সেখানে কীভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং ভারত- বিরোধী কার্যকলাপ শুরু হয়েছিল। কাশ্মীরের হিন্দু রাজা হরি সিংহ যেমন কাশ্মীরের ভারতে অন্তর্ভুক্তি চেয়েছিলেন, তেমনই ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা শেখ আবদুল্লাহও চেয়েছিলেন কাশ্মীর ভারতের ভিতরেই থাকুক। কিন্তু আবদুল্লাহর চাওয়ার পিছনে একটি রাজনীতি ছিল। আবদুল্লাহ বুঝেছিলেন, কাশ্মীর যদি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে মহম্মদ আলি জিন্নাহ এবং মুসলিম লিগের দাপটে তিনি কার্যত গুরুত্বহীন হয়ে পড়বেন। কাজেই, খাতায়-কলমে কাশ্মীরকে ভারতে রেখে কার্যত তাকে একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন প্রজাতন্ত্রের মতোই চালাতে চেয়েছিলেন আবদুল্লাহ। কাশ্মীরের ভারত অন্তর্ভুক্তির পর আবদুল্লাহর এই রাজনীতি প্রকট হয়ে পড়েছিল। আবদুল্লাহর এই বিচ্ছিন্নতাকামী রাজনীতি আরও পরিস্ফুট হয়েছিল তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর ভূমিকায়। নেহরু প্রথমাবধিই কাশ্মীর সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে একমাত্র আবদুল্লাহর সঙ্গেই কথা বলেছেন। এমনকী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেলকেও তিনি এর থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। আবদুল্লাহর যাবতীয় অন্যায় দাবি একতরফা ভাবে মেনেও নিতেন নেহরু।

ভারত সরকারকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে আবদুল্লাহ যে নিজের মর্জিমাফিক কাশ্মীরকে পরিচালনা করতে চান— ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাস থেকেই সে সংবাদ কেন্দ্রের কাছে এসে পৌঁছতে থাকে। সে সংবাদে বল্লভভাই প্যাটেলসহ নেহরু সরকারের বরিষ্ঠ কয়েকজন মন্ত্রী উদ্বিগ্নও হচ্ছিলেন। তাঁরা অশনি সংকেত দেখতে পাচ্ছিলেন এর ভিতরে। কিন্তু নেহরু তাঁদের উদ্বেগকে গুরুত্বই দেননি। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কাঁওয়ার দলিপ সিংহকে ভারত সরকারের এজেন্ট জেনারেল হিসেবে কাশ্মীরে পাঠানো হয়েছিল। দলিপ সিংহ নেহরুকে রিপোর্ট দেন যে, আবদুল্লাহ ভারত সরকারের সমস্ত নীতি উপেক্ষা করছেন এবং নিজের মর্জিমতো রাজ্যটিকে চালাচ্ছেন। নেহরু সে রিপোর্ট উপেক্ষা করলে দলিপ সিংহ পদত্যাগ করেন। এই সময় বিচারপতি মেহেরচাঁদ মহাজন ছিলেন কাশ্মীর রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী। তিনিও আবদুল্লাহর ভারত-বিরোধী কার্যকলাপের বিরোধিতা করেছিলেন। আবদুল্লাহ তাঁকে অপমানজনকভাবে রাজ্য

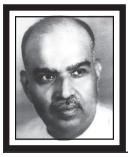

থেকে বিতাড়িত করলেন। নেহরু সব জানলেন। জেনেবুঝেও চুপ করে রইলেন। শেখ আবদুল্লাহ চেয়েছিলেন জম্মু-কাশ্মীরে তাঁর নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল কনফারেন্সের নিরঙ্কুশ আধিপত্য কায়েম করতে। অতএব হিন্দু অধ্যুষিত জম্মুতে ডোগরাদের ওপর আবদুল্লাহর নির্যাতন নেমে এল। জম্মুর অবিসংবাদিত নেতা পণ্ডিত প্রেমনাথ ডোগরা-সহ বেশ কয়েকজনকে বিনা বিচারে আটক করা হলো। অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল জম্মুর পরিস্থিতি। সেই সময় জম্মুর বিশিষ্ট মহিলাদের এক প্রতিনিধিদল দিল্লিতে এসে শ্যামাপ্রসাদ-সহ কয়েকজন সংসদ সদস্যকে সেখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন। শ্যামাপ্রসাদ তাঁদের পরামর্শ দেন বিষয়টি নেহরুকে বলতে। কেননা কাশ্মীর নিয়ে যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার তা নেহরুই নেবেন। অবশেষে ১৯৪৮ সালের শেষ দিকে ভারত সরকারের মধ্যস্থতার প্রেমনাথ ডোগরাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

১৯৪৯-এর প্রথম দিকে কাশ্মীরের জন্য একটি নির্বাচিত সংবিধান সভা গঠন করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হলো। প্রেমনাথ ডোগরার নেতৃত্বাধীন প্রজা পরিষদ এই সংবিধান সভার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য ৫২ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা দেয়। কিন্তু এবারও শেখ আবদুল্লাহর প্রতি অনুগত প্রশাসন নির্লজ্জ আচরণ করল। সংবিধান সভায় যাতে আবদুল্লাহর কোনো বিরোধীই না থাকে, তার জন্য তারা প্রজা পরিষদের ৫২ জন প্রার্থীর ভিতর ৪৯ জনের মনোনয়নই বাতিল করে দেয়। প্রেমনাথ ডোগরা ছুটে এলেন দিল্লিতে। সমগ্র বিষয়টি নেহরু সরকারের গোচরে আনার চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু সরকারের ভূমিকা তাঁকে হতাশাই করল। সরকারের বাইরের বহু নেতা এমনকী বহু কংগ্রেসি নেতাও প্রেমনাথ ডোগরাকে নির্বাচন বয়কটের পরামর্শ দিলেন। এই সময় জনসঙ্ঘের নেতা বলরাজ মাধোক শ্যামাপ্রসাদকে সম্পূর্ণ পরিস্থিতি অবহিত করেন এবং জানান, প্রজা পরিষদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না। শ্যামাপ্রসাদ নির্বাচন বয়কট করার এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেননি। শ্যামাপ্রসাদের বক্তব্য ছিল, প্রজা পরিষদ যদি একজনকেও সংবিধান সভায় পাঠাতে পারে, তাহলেই তাদের অনেকটা রাজনৈতিক লাভ হবে। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদের এই সিদ্ধান্ত প্রজা পরিষদ নেতাদের কাছে পৌঁছনোর আগেই তাঁরা নির্বাচন বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন।

সংবিধান সভা নিজের পেটোয়া লোকদের দিয়ে ভরিয়ে দেওয়ার পরই পূর্ণোদ্যমে ভারত-বিরোধী এবং বিচ্ছিন্নতাকামী কাজকর্ম শুরু করে দিলেন আবদুল্লাহ। কমিউনিস্টদের প্রেরণায় ও উৎসাহে কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা প্রয়োগে পুরোপুরি উদ্যোগী হলেন। দেশের অবশিষ্ট অংশের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করার বদলে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে দিতে উদ্যোগী হলেন তিনি। আবদুল্লাহ প্রচার করলেন— প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার বিষয়ে ভারতের সঙ্গে একটি সীমিত চুক্তি হয়েছে। এর বাইরে ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরের কোনো সম্পর্ক নেই। আবদুল্লাহ দাবি তুলেছিলেন, ভারত কয়েক হাজার স্থানীয় সৈনিকদের একটি বাহিনী গঠন করে তাদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র তুলে দিক। এই বাহিনীর নেতৃত্ব থাকবে শেখ আবদুল্লাহর নেতৃত্বাধীন সরকারের হাতে। রাজ্যের টেলিগ্রাম এবং টেলিফোন কেন্দ্রগুলিকে কেন্দ্রের হাতে তুলে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না আবদুল্লাহ। পররাষ্ট্র সম্পর্কিত বিষয়েও তিনি ভারত সরকারকে এড়িয়ে চলেছিলেন। দিল্লি এবং মুম্বইয়ে অবস্থিত তাঁর বাণিজ্য প্রতিনিধিদের মাধ্যমে বিদেশি দূতাবাসগুলির সঙ্গে স্বতন্ত্র সম্পর্ক উদ্যোগী হন তিনি। এরই পাশাপাশি রাজ্যের সমস্ত ভবন থেকে ভারতের জাতীয় পতাকা সরিয়ে ফেলে ন্যাশনাল কনফারেন্সের পতাকা উত্তোলন করা হয়। রাজ্যের শিক্ষামূলক পাঠক্রম থেকে পরিকল্পিতভাবে হিন্দিকে বাতিল করা, সরকারি অফিসের কাজকর্ম থেকে হিন্দির অবলুপ্তিকরণ, জম্মু থেকে বহুমূল্য সামগ্রী এবং বেশ কয়েকটি সংস্থাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া, জম্মুকে খণ্ডিত করে কাশ্মীর উপত্যকার সঙ্গে ওই অঞ্চলগুলিকে সংযুক্ত করে নতুন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা তৈরি করা— এসব কাজের মাধ্যমে কাশ্মীরকে ক্রমশ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে চাইছিলেন আবদুল্লাহ। আজ যে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের আগুন জ্বলেছে কাশ্মীরে তার বীজ সেদিনই রোপণ করা হয়েছিল।

আবদুল্লাহ এবং তাঁর মন্ত্রীসভার সদস্যরা এরই ভিতর নানাভাবে বিবৃতি দিয়ে বোঝাতে চান যে, কাশ্মীর আদৌ ভারতের কোনো অঙ্গরাজ্য নয়। এটি কার্যত একটি স্বতন্ত্র প্রজাতন্ত্র। ১৯৫২ সালের ২৪ মার্চ আবদুল্লাহ মন্ত্রীসভার রাজস্বমন্ত্রী মির্জা আফজল বেগ রাজ্যের সংবিধান সভায় বলেন, 'ভারতীয় যুক্তরাজ্যের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীর একটি গণরাজ্য হবে। রাজ্যের সংবিধান সম্বন্ধে আমাদের লক্ষ্য হলো এই যে, এর কাঠামোকে এমনভাবে তৈরি করতে চাই যাতে এই রাজ্য অন্য প্রজাতন্ত্রের মতো একটি প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়। আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী এই রাজ্যের নিজস্ব প্রেসিডেন্ট, পৃথক জাতীয় পতাকা এবং পৃথক বিচার ব্যবস্থা থাকবে।' এরপর ২৯ মার্চ শেখ আবদুল্লাহ স্বয়ং সংবিধান সভায় ঘোষণা করেন, 'আমরা একশো শতাংশ সার্বভৌম সত্তা। আমাদের প্রগতির পথে কোনো দেশই বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। ভারতীয় সংসদ বা এই রাজ্যের বাইরে কোনো সংসদেরই আমাদের উপর কোনো আইনগত অধিকার নেই।

শেখ আবদুল্লাহ এবং তাঁর সহকর্মীদের এইসব মন্তব্য এবং জম্মু-কাশ্মীরের ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করে শ্যামাপ্রসাদ বুঝতে পারছিলেন, কাশ্মীরকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার জঘন্য চক্রান্ত শুরু হয়ে গিয়েছে। এরই ভিতর নেহরুর অপরিণামদর্শীতার কারণে কাশ্মীরের এক-তৃতীয়াংশ পাকিস্তান দখল করে নেয়। শ্যামাপ্রসাদের মনে হয়েছিল, জম্মু-কাশ্মীরের যে অংশ এখনও ভারতের ভিতরে রয়েছে, শেখ আবদুল্লাহর বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপের ফলে তা ভবিষ্যতে ভারতের হাতছাড়া হতে পারে। শেখ আবদুল্লাহকে ধিক্কার জানিয়ে শ্যামাপ্রসাদ বলেছিলেন— 'বাঁ-হাতে সংযুক্তি এবং জামার

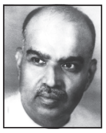

আস্তিনে বিচ্ছিন্নতাবাদ।’ শ্যামাপ্রসাদ বুঝতে পারছিলেন, কাশ্মীর পরিস্থিতি যে জায়গায় পৌঁছচ্ছে, তাতে চুপচাপ বসে থাকলে সমগ্র কাশ্মীরই ভারতের হাতছাড়া হয়ে যাবে। ভারতের অখণ্ডতার ওপর নেমে আসবে বিরাট আঘাত। ১৯৫২ সালের ১৪ জুন তিনি জনসঙ্ঘের কার্যকরী সমিতিতে একটি প্রস্তাব পাশ করান। তাতে বলা হয়— ‘মুসলিম লিগের বিভেদকামী রাজনীতি ভারতকে খণ্ডিত করেছে। তার ফল হয়েছে মারাত্মক। জম্মু-কাশ্মীরকে ওই পথে চলতে দেওয়ার অর্থ হবে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেওয়া।’ এই প্রস্তাবেই ২৯ জুন সারা দেশে কাশ্মীর দিবস পালনের ডাক দেওয়া হয়। কাশ্মীর দিবসের তিনদিন আগে ২৬ জুন শ্যামাপ্রসাদের আহ্বানে দিল্লিতে সংসদ ভবনের সামনে বিরাট জনসমাবেশ হয়।

এই জনসমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে শ্যামাপ্রসাদ বলেন, ‘কাশ্মীরের জন্য স্বতন্ত্র পতাকা হতে পারে না। এটা পঞ্চাশ-পঞ্চাশের প্রশ্ন নয়। এটা হলো ভারত রাষ্ট্রের জন্য একটিমাত্র পতাকা ব্যবহারের প্রশ্ন। কাশ্মীর ভারতের অন্তর্গত। সেখানে স্বতন্ত্র কাশ্মীর প্রজাতন্ত্র ও তার স্বতন্ত্র পতাকার কোনো প্রশ্নই থাকতে পারে না। আপনারা যদি শুধুই হাওয়ার সঙ্গে খেলা করেন আর বলেন আমরা অসহায় এবং শেখ আবদুল্লাহ যা ইচ্ছা করে যান, তাহলে আমি জোর দিয়ে বলব যে, কাশ্মীর হাতছাড়া হয়ে যাবে।’

কাশ্মীর দিবসে সাধারণ মানুষের বিপুল সাড়া দেখে নেহরু শেষে আবদুল্লাহকে দিল্লি ডেকে পাঠালেন। নানা টালবাহানার পর ১৯৫২ সালের ১৬ জুলাই আবদুল্লাহ দিল্লি এলেন এবং ২৪ জুলাই নেহরুর সঙ্গে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন। এই চুক্তিতে সই করে আবদুল্লাহ তাঁর মনোমতো সবকিছু আদায় করে নিয়ে যান। এই চুক্তি অনুযায়ী আবদুল্লাহকে স্বতন্ত্র সংবিধান, স্বতন্ত্র পতাকা গ্রহণের অধিকার দেওয়া হয়। কার্যত বিচ্ছিন্নতাবাদেরই জয় হয় এই চুক্তিতে। শ্যামাপ্রসাদ এই চুক্তি মেনে নিতে পারেননি। তাঁর মনে হয়েছিল এই চুক্তি ভারতের সার্বভৌমত্বকে পদদলিত করতে

ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে শ্যামাপ্রসাদ (১৯৫২)

চাইছে।

১৯৫২ সালের ৭ আগস্ট সংসদে নেহরুর সামনে সরাসরি দুটি প্রশ্ন রাখলেন শ্যামাপ্রসাদ। বললেন, ‘কাশ্মীরের যে অংশ পাকিস্তান দখল করে রেখেছে তা ভারতের ফিরে পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে কি? রাষ্ট্রসঙ্ঘের মাধ্যমে আমরা ফেরত পাব না। পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমেও তা ফেরত পাব না। আমরা যদি বলপ্রয়োগ না করি তাহলে সেটা হাতছাড়া হবে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তা করতে চান না। আমাদের এই সত্যের মুখোমুখি হতে হবে যে, আমরা কি কাশ্মীরের ওই অংশ হাতছাড়া করতে প্রস্তুত?’

শেখ আবদুল্লাহর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে শ্যামাপ্রসাদ বলেন, ‘আবদুল্লাহ তো ভারতে সংবিধান রচনার অন্যতম অংশীদার ছিলেন। অবশিষ্ট ভারত যদি এই সংবিধানকে মেনে নিতে পারে, তাহলে কাশ্মীরের ব্যাপারে তিনি এটা মেনে নেবেন না কেন?’ সংসদে দাঁড়িয়ে নেহরু শ্যামাপ্রসাদের এই দুটি প্রশ্নেরই কোনো জবাব দিতে পারেননি। এরপরই শ্যামাপ্রসাদ স্থির করেন ৮ আগস্ট তিনি কাশ্মীরের উদ্দেশে রওয়ানা দেবেন। ঠিক হলো, দুই সংসদ সদস্য ইউএম ত্রিবেদী এবং বাবু রামনারায়ণ সিংহ, জনসঙ্ঘ নেতা বলরাজ মাধোক এবং কয়েকটি সংবাদপত্রের প্রতিনিধি তাঁর সঙ্গে যাবেন। কিন্তু যাত্রার দিন জানা গেল তাঁর এবং তাঁর সঙ্গীদের কাশ্মীরে প্রবেশের পারমিট দেয়নি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। একথা জানার পর শ্যামাপ্রসাদ সরাসরি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। অবশেষে যাত্রার কিছুক্ষণ আগে তাঁর হাতে পারমিট এসে পৌঁছয়।

৯ আগস্ট রাতে শ্যামাপ্রসাদ জম্মুতে এসে পৌঁছন। জম্মুতে বিপুল অভ্যর্থনা পেলেন শ্যামাপ্রসাদ। ১০ আগস্ট সকালের বিমানে শ্রীনগরে পৌঁছে বিমানবন্দর থেকেই সোজা গেলেন শেখ আবদুল্লাহর বাসভবনে। শেখ আবদুল্লাহ এবং তাঁর সহকারী, বকশি গুলাম মহম্মদের সঙ্গে প্রায় ছ’ ঘণ্টা বৈঠক হলো শ্যামাপ্রসাদের। শোনা যায়, ওই বৈঠকে আবদুল্লাহ প্রায় হুমকির সুরে কথা বলেছিলেন। তবু টলাতে পারেননি শ্যামাপ্রসাদকে। কাশ্মীর থেকে ফিরে নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন শ্যামাপ্রসাদ। কাশ্মীর সমস্যাকে লঘু করে দেখার কোনো কারণ নেই— একথাও বলেন নেহরুকে। কিন্তু নেহরু সে কথায় কোনো কর্ণপাতই করেননি। নেহরুর এই ভূমিকার ফলে শেখ আবদুল্লাহ কাশ্মীরকে সমগ্র ভারত

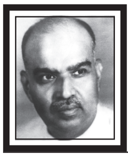

থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াসে পূর্ণ উদ্যমে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা পেয়ে গেলেন। আবদুল্লাহর নিজেদের লোকদের নিয়ে গঠিত সংবিধান সভায় কাশ্মীরের জন্য স্বতন্ত্র পতাকার প্রস্তাব গ্রহণ করা হলো। সেই সঙ্গে কাশ্মীর রাজ্যে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা নিষিদ্ধ করা হলো। পরিবর্তে শেখ আবদুল্লাহ কর্তৃক নিযুক্ত কনস্টিটিউশন ড্রাফটিং কমিটি এমন এক খসড়া সংবিধান কাশ্মীরের জন্য তৈরি করল, যেখানে জম্মু ও কাশ্মীরকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাজ্য বলে স্বীকৃতি দেওয়া হলো। বলা হলো— এর নিজস্ব পতাকা, নিজস্ব সুপ্রিম কোর্ট এবং নিজস্ব জাতীয় বিধানসভা থাকবে। এক কথায় কাশ্মীরকে বাকি ভারতের থেকে বিচ্ছিন্ন করার কাজ সেরে ফেললেন শেখ আবদুল্লাহ। আর নেহরু নীরবে তাতে পরোক্ষ মদত দিয়ে গেলেন।

৮ নভেম্বর জলন্ধরে পণ্ডিত প্রেমনাথ ডোগরা শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করলেন। শ্যামাপ্রসাদ তাঁকে আশ্বাস দিলেন, জনসঙ্ঘ প্রজা পরিষদের আন্দোলনের পাশে থাকবে এবং কাশ্মীর বিষয়ে জনমতকে সংগঠিত করবে। শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে প্রেমনাথ ডোগরার এই আলোচনার পরদিনই কাশ্মীর সরকার ঘোষণা করল, জম্মুর রাজ্য সচিবালয়ে ১৭ নভেম্বর কাশ্মীরের স্বতন্ত্র পতাকা উত্তোলন করা হবে। এই ঘোষণার পর জম্মুর পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠল। অবস্থা অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠছে দেখে প্রধানমন্ত্রী নেহরু শেখ আবদুল্লাহর হাত শক্ত করতে কয়েক ব্যাটেলিয়ান কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ জম্মুতে পাঠিয়ে দিলেন। কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রজাপরিষদের সমর্থকদের ওপর দমন-পীড়ন শুরু করল।

এত করেও জম্মুর সচিবালয়ে কাশ্মীরের স্বতন্ত্র পতাকা তোলা যায়নি। অবশেষে ২৬ নভেম্বর প্রেমনাথ ডোগরাকে গ্রেপ্তার করল কাশ্মীর পুলিশ।

১৯৫৩-র গোড়া থেকে শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে নেহরু এবং শেখ আবদুল্লাহর কাশ্মীর সংক্রান্ত অনেকগুলি পত্র বিনিময় হয়। কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে নেহরু এবং আবদুল্লাহকে বারংবার আলোচনায় বসার আহ্বান জানান শ্যামাপ্রসাদ। আবদুল্লাহ কোনো আলোচনাতেই বসতে রাজি ছিলেন না। নেহরুও আবদুল্লাহর সম্মতি ব্যতিরেকে কোনো আলোচনায় যেতে চাননি।

১৯৫৩ সালের ৫ মার্চ সারাদেশে জম্মু-কাশ্মীর দিবস পালন করার ডাক দিলেন শ্যামাপ্রাসাদ। ২৬ এপ্রিল সংসদে ভাষণ দিতে গিয়ে শ্যামাপ্রসাদ নেহরুকে আর একবার অনুরোধ করেন— কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হতে। কিন্তু নেহরুর দিক থেকে কোনোরকম সাড়াশব্দ না পেয়ে শ্যামাপ্রসাদ ঠিক করেন, তিনি আর একবার কাশ্মীর যাবেন। দ্বিতীয়বার শ্যামাপ্রসাদকে কাশ্মীর যেতে অনেকেই নিষেধ করেছিলেন। শ্যামাপ্রসাদের ঘনিষ্ঠরা আশঙ্কা করেছিলেন, এবার কাশ্মীর গেলে শ্যামাপ্রসাদ বিপদের সম্মুখীন হতে পারেন।

১৯৫৩ সালের ৮ মে জম্মুর উদ্দেশে রওয়ানা হলেন শ্যামাপ্রসাদ। তিনি জম্মুর উদ্দেশে রওয়ানা হতেই পর্দার অন্তরালে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গেল। পাঠানকোটে জনতা রাজকীয় সংবর্ধনা জানালো শ্যামাপ্রসাদকে। ২১ মে বিকেলে শ্যামাপ্রসাদ এবং তাঁর সঙ্গীরা মাধোপুর চেকপোস্টে পৌঁছলে কাশ্মীর পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করল। তাঁকে গ্রেপ্তার করার সময় শ্যামাপ্রসাদ তাঁর সঙ্গীদের বলেছিলেন, ‘এটা ভারত সরকার এবং কাশ্মীর সরকারের মিলিত ষড়যন্ত্র। তোমরা ফিরে গিয়ে দেশের মানুষকে বলো, আমি কাশ্মীরে প্রবেশ করেছি। তবে বন্দি হিসাবে।’

বন্দি অবস্থাতেই ২৩ জুন কাশ্মীরে মৃত্যু হয় শ্যামাপ্রসাদের। শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর পর এমন কিছু তথ্য প্রকাশ পেয়েছে, যাতে পরিষ্কার হয়, তাঁর মৃত্যু স্বাভাবিক ছিল না। প্রথমত, সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে মৃত্যুর যে সময় উল্লেখ করা হয়েছে— তা ঠিক নয়। কারণ, হাসপাতালের উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং অন্যান্য রোগীদের থেকে জানা যায়, ভোর ৩টে ৪০-এ নয়। শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু হয়েছিল রাত আড়াইটেয়। দ্বিতীয়ত, হাসপাতালের একটি সূত্র থেকে জানা যায়, শ্বাসকষ্ট হলেও শ্যামাপ্রসাদকে আদৌ অক্সিজেন দেওয়া হয়নি। হাসপাতাল সূত্রেই আরও জানা যায়, জনৈক চিকিৎসক রাত দুটোর সময় শ্যামাপ্রসাদকে একটি ইনজেকশন দেন। এরপরই শ্যামাপ্রসাদের অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। কর্তব্যরত নার্স তখন ওই চিকিৎসককে বারবার টেলিফোন করেন। কিন্তু ওই চিকিৎসক আর শ্যামাপ্রসাদকে দেখতে অসেননি।

তৃতীয়ত, শ্যামাপ্রসাদ নিয়মিত ডায়েরি লিখতেন। বন্দি অবস্থাতেও তিনি নিয়মিত ডায়েরি লিখেছেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর এই ডায়েরিটি বাজেয়াপ্ত করেছিল শেখ আবদুল্লাহর প্রশাসন। ওই ডায়েরিটি শ্যামাপ্রসাদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি। চতুর্থত, শ্যামাপ্রসাদ যতদিন বন্দি ছিলেন, তাঁর পরিবারের কোনো সদস্যের সঙ্গে তাঁকে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। পঞ্চমত, শ্যামাপ্রসাদকে শ্রীনগরে এবং হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতেন ডাঃ আলি মহম্মদ। ডাঃ রামনাথ পারিহার নামে কোনো চিকিৎসক কোনোদিনই শ্যামাপ্রসাদকে দেখেননি। তবু ডেথ সার্টিফিকেটেই ডাঃ আলি মহম্মদের সঙ্গে জনৈক ডাঃ রামনাথ পারিহার নামটি জুড়ে দেওয়া হয়েছিল।

শ্যামাপ্রসাদের আইনজীবী ইউ এম ত্রিবেদী পরে জানিয়েছেন, তিনি যখন শ্রীনগরে অবস্থান করছিলেন, সেই সময়ে শ্রীনগরের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে দেখা করে বলেছিলেন— ‘শ্যামাপ্রসাদকে একা রেখে আপনি ফিরে যাবেন না। ওরা শ্যামাপ্রসাদকে মেরে ফেলবে।’ শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর পর শ্রীনগরে পুলিশের এক উচ্চপদস্থ কর্তা ত্রিবেদীর সঙ্গে দেখা করে বলেছিলেন, ‘ওরা শ্যামাপ্রসাদকে খুন করেছে। আমি ওদের গুলি করে মারব।’

দেশের অখণ্ডতা রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন শ্যামপ্রসাদ। সেই শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুরহস্য তদন্ত করে এই ঘৃণ্য অপরাধের অন্তরালের কারিগর কারা— তা প্রকাশ করা বাংলার মানুষের দাবি। সেই দাবিকে মান্যতা দিক কেন্দ্র সরকার। ■

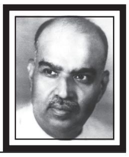

শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন রাজনৈতিক হিন্দু

মোহিত রায়

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী পশ্চিমবঙ্গে প্রায় একটি হারিয়ে যাওয়া চরিত্র। নামটি অনেকেই জানেন, কিন্তু সে পরিচয় মুখ্যত 'বাংলার বাঘ' আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পুত্র হিসেবে। কেন সুযোগ্য এই বিষয়টি প্রায়শই একটি ধোঁয়াশা। কারণ স্কুল কলেজে শ্যামাপ্রসাদ নিয়ে কোনো আলোচনা-অনুষ্ঠান হয় না, তাঁর মূর্তিও খুব একটা দেখা যায় না। ঘরে ঘরে ঝোলা বাংলা ক্যালেন্ডারে বিবেকানন্দ-ক্ষুদিরাম- সুভাষ মায় গান্ধী-নেহরুর ছবি একসঙ্গে দেখা যায় কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ তাতে স্থান পান না। কলকাতা শহরের একটি প্রধান রাজপথ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড— এইটুকুই বোধহয় তাঁর নিত্য পরিচয়, তাও হয়তো নতুন প্রজন্মের কাছে সেটি শুধুই এস পি মুখার্জী রোড। অতি সম্প্রতি দেশজুড়ে ও কিছুটা পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির জোয়ারে শ্যামাপ্রসাদ আবার বাংলার মানুষের মনে ফিরছেন, এটাই আশা।

কিন্তু কেন হারিয়ে গেলেন শ্যামাপ্রসাদ? যে বাংলার হিন্দুদের জন্য তিনি প্রায় একক প্রচেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গ স্থাপিত করলেন তারাই শ্যামাপ্রসাদকে ব্রাত্য করে রাখল। যে পূর্ববঙ্গের সর্বস্বান্ত হিন্দু উদ্বাস্তুদের জন্য তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করলেন সেই উদ্বাস্তুরা তাঁকে ভুলে গেল। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর পর যে লক্ষ লক্ষ মানুষ এক অবিস্মরণীয় শোকযাত্রায় পা মিলিয়েছিল তারা তাঁকে আর বেশিদিন মনে রাখেনি। এই সব কিছুর জন্য যে বড় কারণ তা হলো পশ্চিমবঙ্গে তথাকথিত কাপুরুষোচিত ধর্মনিরপেক্ষতা বা মুসলমান তোষণের রাজনীতির ক্রমিক প্রতিষ্ঠা। এই মতবাদের প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক দায়িত্ব জওহরলাল নেহরুর ও তাঁর বিরুদ্ধে নীরব পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস দলটির। ১৯৫০-এর ফেব্রুয়ারিতে পূর্ব পাকিস্তানে ভয়াবহ হিন্দু নিধন পর্বের পর শ্যামাপ্রসাদ ও বাংলার অন্য সাংসদরা লোকসভায় পঞ্জাবের মতন বাংলায় হিন্দু-মুসলমান লোক বিনিময় দাবি করেছিলেন। জওহরলাল নেহরু তার বদলে করলেন নেহরু- লিয়াকত চুক্তি যাতে পূর্ব পাকিস্তানে চলে যাওয়া মুসলমানরা পশ্চিমবঙ্গে ফিরে আসতে পারেন। তাঁর আশা একইরকম ভাবে হিন্দু উদ্বাস্তুরা ফিরে যাবেন পাকিস্তানে। এই অবাস্তব ধারণা, ইসলামি মৌলবাদকে এভাবে তুষ্ট করবার বিরুদ্ধে পদত্যাগ করেছিলেন ভারতের মন্ত্রীসভার দুই বাঙালি মন্ত্রী— শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ও ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী। বাংলার কংগ্রেস যেদিন এই চুক্তি মেনে নিল, সেদিন থেকেই শুরু হয়ে গেল ইসলামি পশ্চিমবঙ্গের জয়যাত্রা। এই পশ্চিমবঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ যে ক্রমশ হারিয়ে যাবেন তাই বোধহয় স্বাভাবিক।

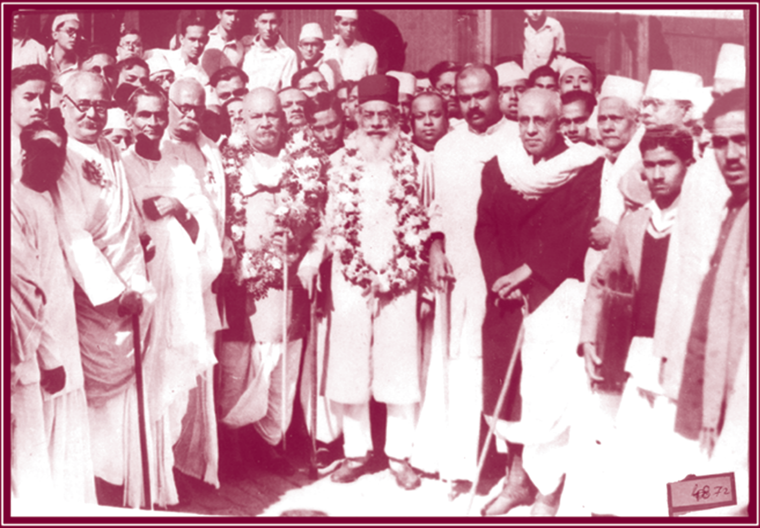

কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার কনফারেন্স : শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে রয়েছেন ড. মুঞ্জে, মন্মথনাথ মুখার্জী, এস এন ব্যানার্জি, এন কে বসু, সুরেন বসু প্রমুখ।

কারো প্রাসঙ্গিকতা শেষ হয়ে গেলে তিনি ক্রমশ জনমানস থেকে ম্লান হয়ে যান, এটা মেনে নিতে হয়। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদের ক্ষেত্রে বিষয়টা শুধু বিস্মরণ নয়, শ্যামাপ্রসাদকে করে তোলা হলো এক সাম্প্রদায়িক গোঁড়া হিন্দু নেতা। ফলে 'সেকুলার' বাংলায় তিনি বর্জনীয়। এই কাজটি করলো কমিউনিস্ট পার্টি ও তাবৎ বামপন্থীরা। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস ইসলামি মৌলবাদকে তোষণের ইতিহাস। কেন্দ্রীয় সরকারের অসহযোগিতায় উদ্বাস্তু আন্দোলনের নেতৃত্ব কংগ্রেসের হাত থেকে চলে গেল কমিউনিস্টদের হাতে। এই কমিউনিস্টরা তৈরি করলো সেকুলার উদ্বাস্তু আন্দোলন। এই উদ্বাস্তু আন্দোলন নিজেদের দাবিদাওয়ার জন্য জঙ্গি আন্দোলন,

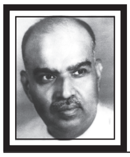

পশ্চিমবঙ্গের জমি দখলের লড়াকু আন্দোলন---একই সঙ্গে যে ইসলামি অত্যাচারে পালিয়ে আসা সেই ইসলামি অত্যাচারের ইতিহাসকে গোপন রাখার আন্দোলন। এই আন্দোলন আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গে তিনদশকের বামপন্থী অপশাসনের প্রতিষ্ঠার ভিত্তি। নেহরু-লিয়াকত চুক্তির ফলে পশ্চিমবঙ্গের যে ভয়ঙ্কর সর্বনাশ হয়ে গেল সেই জমিতে ইসলামি মৌলবাদের বিষবৃক্ষকে রোপণ করলো কমিউনিস্টরা। আর এর প্রসারের জন্য প্রয়োজন শ্যামাপ্রসাদকে শুধু বিস্মরণ নয়, তাকে সাম্প্রদায়িক হিন্দুতে পরিণত করা।

এটা মানতেই হবে যে পঞ্চাশের দশক থেকে আশির দশক পর্যন্ত সারা বিশ্বেই বামপন্থী চিন্তার দাপট দেখা গেছে। চীন বিপ্লব, এশিয়ার দেশগুলির একের পর এক স্বাধীনতা প্রাপ্তি, ভিয়েতনাম, কিউবা, ফরাসি ছাত্র আন্দোলন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের উন্নয়নের জয়যাত্রা— এইসব আবহে ছাত্রযুবদের একটা বড় অংশ জঙ্গি বামপন্থী চিন্তার দিকে ঝুঁকেছিল। বিশ্বের লেখাপড়ার জগতেও বামপন্থী মেধার জোয়ার। পশ্চিমবঙ্গে এর প্রভাবটা ছিল প্রায় সর্বাত্মক। প্রায় সব হিন্দু বাঙালি বুদ্ধিজীবীই হয়ে গেলেন বামপন্থী। কমিউনিস্ট ঘরানার সবচেয়ে বড় আক্রমণ হলো ইতিহাসকে বিকৃত করা। যেজন্য কমিউনিস্ট শাসিত দেশগুলির কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায়, এমনকী ফোটোগ্রাফ থেকে কোপে পড়া নেতাদের ছবি মুছে ফেলা হয়। ভারতে এই কাজটি সুচারু ভাবে করলো মুসলমান তোষণকারী জওহরলালের নামাঙ্কিত দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ও সাম্প্রদায়িক আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের বামপন্থী ঐতিহাসিকেরা। পশ্চিমবঙ্গে এরাই হিরো। এরপর সাবঅলটার্ন ইত্যাদি নাম নিয়ে যে সমাজতাত্ত্বিক ঐতিহাসিকরা হাজির হয়েছেন তাঁদের সবার সুর সেই মুসলমান তোষণে বাঁধা। এভাবেই গত পঞ্চাশ বছর ধরে সৃষ্টি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-সাহিত্য, বিপ্লবী সুভাষ মুখোপাধ্যায় থেকে 'অপসংস্কৃতি'-র সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বা 'নিরপেক্ষ' শঙ্খ ঘোষ, মায় অনুকূল-ভক্ত শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়— সবাই আগমার্কা সেকুলার। এই পশ্চিমবঙ্গে তাই প্রয়োজন শুধু শ্যামাপ্রসাদের বিস্মরণ নয়, তাঁকে বাঙালি মনন থেকে বিতাড়ন। ফলে বাংলার এত বড় মাপের একজন বিদ্বান মানুষকে নিয়ে চর্চা আর হলোই না। কে করবে সাহস করে?

ইতিহাস বা সমাজবিদ্যার যে গবেষকটি এই কাজ করতে যাবে তার জন্য দিকে দিকে সব দরজা বন্ধ হয়ে যাবে, সে পাবে না রিসার্চ গ্রান্ট, প্রকাশনার সুযোগ, কোনো প্রধান দৈনিক থেকে জার্নালে লেখা ছাপা হবে না, মোটামুটি তার অ্যাকাডেমিক কেরিয়ারকে পাঠানো হবে গোরস্তানে। সুতরাং শ্যামাপ্রসাদ নিয়ে চর্চা খুব কম। বাংলায় শ্যামাপ্রসাদ নিয়ে সার্বিক গবেষণা গ্রন্থ নেই, গোটা পাঁচেক ছোট আকারের বই আছে যেগুলি মূলত প্রচারধর্মী। পূর্ববঙ্গের হিন্দু নিপীড়নের ইতিহাসকে এখন বাঁচিয়ে রেখেছেন এক প্রযুক্তিবিদ— তথাগত রায়। বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজ্যপাল। তথাগত রায়ের ২০১২-তে প্রকাশিত ইংরেজিতে শ্যামাপ্রসাদের জীবনী গ্রন্থ (The Life and Times of Dr. Syama Prasad Mookerjee) একটি অনবদ্য সংযোজন। এটির বাংলা অনুবাদ হচ্ছে। সেটি প্রকাশিত হলে বাংলায় শ্যামাপ্রসাদ চর্চার অভাব অনেকটা মিটবে। ২০০১ সালে শ্যামাপ্রসাদের জন্মশতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে কিনা সন্দেহ রয়েছে। গত ত্রিশ বছরে পশ্চিমবঙ্গের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্যামাপ্রসাদকে নিয়ে কোনো উপযুক্ত গবেষণা হয়েছে বলেও জানি না। জন্মশতবর্ষে প্রকাশিত হয়েছিল দু-একটি ক্ষীণকায় বই, একটি স্মারক সংকলন গ্রন্থ এবং ড. দীনেশচন্দ্র সিংহের লেখা প্রয়োজনীয় গ্রন্থ 'শ্যামাপ্রসাদ বঙ্গবিভাগ ও পশ্চিমবঙ্গ'।

রাজনৈতিক হিন্দু :

কেবল হিন্দু বলেই কি শ্যামাপ্রসাদের উপর এত রোষ বাম ঘরানার মানুষদের? হিন্দু অনেক কিছুই বাঙালি বামপন্থীরা আত্মস্থ করেছে এবং এই প্রক্রিয়ায় কারো কারো হিন্দুত্বের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। বামপন্থীরা স্বামী বিবেকানন্দকে অনেকদিন পাশে সরিয়ে রাখলেও এখন আর তা করেন না। রামকৃষ্ণ মিশন তো দীর্ঘদিন ধরেই বামপন্থীদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান। লোকনাথ-অনুকূল-বালক ব্রহ্মচারী, কারো সঙ্গেই বামপন্থীদের কোনো বিরোধ নেই, এদের ব্যাপক প্রসার বাম আমলেই। এদের প্রসার নিয়ে কখনো বামদলগুলিকে আশঙ্কা প্রকাশ করতে দেখিনি। বাঙালির দুর্গাপূজার ধুম কমেনি তবে বামপন্থা তা পরিণত করেছে শারদোৎসবে। এমনকী 'ফ্যাসিস্ত' নেতাজীর গলাতেও যাঁরা মালা পরাতে শুরু করেছেন, শ্যামাপ্রসাদ নিয়ে তবে তাঁদের এত আপত্তি কেন?

শ্যামাপ্রসাদ যদি একজন হিন্দু ধর্মীয় নেতা হতেন তাহলে এই সমস্যাটা হোত না। শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন একজন রাজনৈতিক হিন্দু। ধর্মীয় রীতিনীতি, পূজাপার্বণ এইসব নিয়ে শ্যামাপ্রসাদ মাথা ঘামাননি। তাঁর চিন্তা ছিল বাঙালি হিন্দুর ভবিষ্যৎ নিয়ে। বাংলাদেশ হবার চল্লিশ বছর পর এখন আমাদের বলার সময় এসেছে যে বাঙালি হিন্দুই বাঙালি, বাংলাভাষী মুসলমানদের বড় অংশ বাঙালি নন। শ্যামাপ্রসাদের পারিবারিক জীবনে রাজনীতির প্রভাব খুব কম ছিল। তাঁর পিতামহ গঙ্গাপ্রসাদ ছিলেন মেধাবী ছাত্র এবং প্রথম যুগের একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক। পিতা আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বিদ্যার্জন ছিল প্রবাদপ্রতিম।

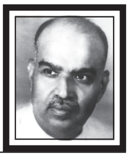

শ্যামাপ্রসাদও ছিলেন একজন অত্যন্ত কৃতী ছাত্র। শ্যামাপ্রসাদ তাঁর পিতার মতন জীবনের প্রথম পর্বে ব্যস্ত ছিলেন শিক্ষা জগতে যেখানে তাঁর অবদান অতুলনীয়। শ্যামাপ্রসাদের রাজনৈতিক জীবনের শুরু ১৯২৯ সালে বঙ্গীয় আইনসভায় কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়ে। কিন্তু এর সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক ছিল সামান্যই। তখনকার নিয়ম অনুযায়ী তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নির্ধারিত আসনে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

১৯৩৭ সালে ভারত শাসন আইন-১৯৩৫ চালু হলো, যার ভিত্তিতে ব্রিটিশ ভারতের রাজ্যগুলিতে আইনসভা নির্বাচন করে রাজ্য সরকারগুলি গঠিত হয়। এই নির্বাচনে অবশ্য ভোট দেবার অধিকার সবার ছিল না এবং ধর্মীয় ও অন্যান্য ভিত্তিতে আইনসভাগুলির আসন নির্দিষ্ট করা হয়। বাংলায় আইনসভায় মুসলমানদের ও ইউরোপিয়দের জন্য বেশি আসন সংরক্ষিত হওয়ায় হিন্দুদের রাজনৈতিক অধিকার খুবই সীমিত হয়ে আসে। বিখ্যাত লেখক নীরদ চৌধুরি লিখছেন যে এর ফলে বাংলায় হিন্দুদের রাজনৈতিক শক্তিকে চিরতরে বঞ্চিত করা হলো। ১৯৩৭ সালে মুসলিম লীগের সরকার (যা সর্বভারতীয় কংগ্রেসের নেতাদের অদূরদর্শী সিদ্ধান্তে ক্ষমতায় আসে) ক্ষমতায় এসেই যে ধরনের কর্মকাণ্ড শুরু করে তা দেখে অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন, 'মনে হলো আবার বাংলায় মুসলমান যুগ ফিরে এসেছে'। এই সময় থেকেই শ্যামাপ্রসাদের রাজনৈতিক চিন্তার এক নতুন পর্ব শুরু হলো।

এই সময় থেকেই শ্যামাপ্রসাদ লক্ষ্য করতে থাকলেন যে কীভাবে একের পর এক বিভিন্ন সরকারি পদক্ষেপে হিন্দুদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। যদিও তখন যুক্ত বাংলার জনসংখ্যার কেবল ৫৪ শতাংশ মুসলমান, তাতেই পুরো রাজ্যে প্রায় ইসলামি শাসন শুরু হয়ে গেল। কলকাতা শহরের জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ হিন্দু হলেও বিল আনা হলো যে কলকাতা পুরসভায় ৪৬ শতাংশ হিন্দু প্রতিনিধি থাকবে। এরপর হাত পড়লো শিক্ষা বোর্ডে। আইনসভায় তিনি এইসব বিলের তীব্র বিরোধিতা জারি রাখলেন। এই সময় ১৯৩৯ সালে শ্যামাপ্রসাদ হিন্দু মহাসভার সঙ্গে যুক্ত হলেন এবং শীঘ্রই তার কার্যকরী সভাপতি হলেন। বাংলার হিন্দু সমাজকে বাঁচাতে এভাবেই তিনি রাজনীতির মঞ্চে এলেন। তিনি ছিলেন ভারত ভাগের বিপক্ষে, কিন্তু ১৯৪৬-এর পর তিনি বললেন ভারত ভাগ না হলেও বাংলা ভাগ করতে হবে। ইসলামি শাসনে বাংলার হিন্দুর কোনো ভবিষ্যৎ নেই। ২ মে, ১৯৪৭-এ মাউন্টব্যাটেনকে লেখা চিঠিতে তিনি বলছেন— 'গত দশ বছরে বাঙালি হিন্দু সাম্প্রদায়িক অপশাসনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে,—শুধু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নয়, সমস্ত ধরনের জাতীয়, শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে'। এই ইসলামি শাসন থেকে মুক্তিই তাঁর রাজনৈতিক লক্ষ্য।

ইসলামি অপশাসন থেকে বাঙালি হিন্দুর মুক্তিই তাঁর রাজনীতির মূল কথা। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৪-এর মধ্যে হিন্দু মহাসভার ভারতের বিভিন্ন স্থানে অধিবেশনে— সিলেট থেকে অমৃতসর— তাঁর দেওয়া ১১টি বক্তৃতার সংকলন— (Awake Hindusthan !–Syama Prasad Mookerjee)। এই বক্তৃতাগুলিতে ভারতের সমসাময়িক রাজনীতি, আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিভিন্ন আলোচনা রয়েছে এবং সেই প্রেক্ষিতে ভারতে হিন্দুদের করণীয় বিভিন্ন ব্যাপারে তিনি মতামত দিয়েছেন। কিন্তু হিন্দু মহাসভার মঞ্চ থেকে বলা এই বক্তৃতাগুলিতে সরাসরি ধর্মসংক্রান্ত আলোচনা নেই বললেই চলে। তিনি প্রায় কোনো হিন্দু ধর্মগুরু বা নেতাদের কথা উল্লেখ করেননি। দীর্ঘ বক্তৃতাগুলিতে শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতিও নেই বললেই চলে। অর্থাৎ তাঁর বক্তব্যের মূল ধারাটি ছিল ভারতীয় হিন্দুর রাজনৈতিক অধিকারের বিষয় যা কেবলমাত্র ভারতীয় সভ্যতার অস্তিত্ব ও অগ্রগতিকে নিশ্চিত করতে পারে।

শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন একটি মুক্তমনা হিন্দু পরিবারের সন্তান যেখানে পূজাপার্বণের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক চিন্তার সংযোগ ছিল। পিতা আশুতোষ মুখোপাধ্যায় অনেক আপত্তি সত্ত্বেও কন্যার বিধবাবিবাহ দিয়েছিলেন। শ্যামপ্রসাদের ধর্মীয় চিন্তা ছিল আধ্যাত্মিক স্তরের, দৈনন্দিন আচার-বিচারের নয়। তাঁর ডায়েরির পাতায় যে ঈশ্বরের কথা তিনি উল্লেখ করছেন, তিনি এই সর্বশক্তিমান দয়াল ঈশ্বর— কোনো বিশেষ দেবদেবী নন (সূত্র : তথাগত রায়ের বই)। এই ঈশ্বরপ্রেম তাঁকে শক্তি জুগিয়েছে এগিয়ে চলার, কোনো বিশেষ সাম্প্রদায়িক লক্ষ্যের জন্য নয়। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার একজন অংশীদার হয়ে, এই সভ্যতাকে ইসলামি আগ্রাসনের হাত থেকে বাঁচাতে, বিশেষ করে বাঙালি হিন্দু সমাজের অস্তিত্বকে রক্ষা করতে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রাজনীতিতে এসেছিলেন। বামপন্থীরা এই রাজনৈতিক হিন্দু শ্যামাপ্রসাদকে ভয় পায়, তাই তাঁকে সাম্প্রদায়িকতার কলুষ মাখিয়ে একেবারে আলোচনার বাইরে রাখতে চায়।

আজকে বাঙালি হিন্দুর অস্তিত্ব পশ্চিমবঙ্গই বিপন্ন। একে রক্ষা করতে আমাদের আবার শ্যামাপ্রসাদের শরণাপন্ন হতে হবে। আজকে চাই রাজনৈতিক হিন্দুর, ধর্মীয় আচার বিচারে তর্কে, শাস্ত্রীয় বিতর্কে না জড়িয়ে হিন্দুদের অধিকারের প্রশ্নটাকে সামনে নিয়ে লড়তে হবে।

(লেখক একজন গবেষক ও পরিবেশবিদ)

With deepest Gratitude

Mr. Nikhil Bhandari

36, Basement 8, Camac Street, Kolkata–700017

SKJ CONSULTANT & FINANCIERS PVT. LTD.

(FRANCHISEE OF ALANKIT ASSIGNMENTS LIMITED)

TIN FACILITATION CENTRE & PAN CENTRE
CERTIFIED FILING CENTRE
FOR MCA-21
E-FILING OF INCOME TAX RETURN

5, Commercial Building, Ground Floor, 23A Netaji Subhas Road , Kolkata-700 001,
Phone : 2242-8964, 4005-0066 E-mail : sunil_skj@rediffmail.com,
sunil_skj@hotmail.com, sunilskj10@gmail.com

H.O. : 6, CommercialBuilding, 1st floor, 23A Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001

LAUREL

With Best Wishes From-

PRAKASH-PRAMOD BAID

Laurel Securities Private Limited

(Member of National Stock Exchange of India Ltd.)

LAUREL ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED

(Investment Advisor Mutual Fund Distributor)

JAIN BAID & COMPANY

(Chartered Accountants)

909-910, Diamond Heritage, 16, Strand Road, 9th Floor, Kolkata - 700001
Phone No. 66153334-39, Fax No. 66153341, Email ID - prakash_laurel@yahoo.com

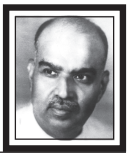

স্বাধীন ভারতের প্রথম শিল্পমন্ত্রী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী

প্রণব দত্ত মজুমদার

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ইং ১৯০১ সালের ৬ জুলাই কলকাতার ভবানীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখার্জী ও যোগমায়া দেবীর দ্বিতীয় পুত্র কিন্তু তৃতীয় সন্তান ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ।

তিনি ম্যাট্রিক, আই এ, বি এ (অনার্স), এম এ, বি এল, সমস্ত পরীক্ষাতেই প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন। ১৯২৪ সালে পিতা স্যার আশুতোষের মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর ১৯২৪ সালেই শ্যামাপ্রসাদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে নির্বাচিত হয়ে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার একটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য হয়ে যান এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯২৫ সালে তিনি ব্যারিস্টার হওয়ার জন্য ইংল্যান্ড যান এবং ব্যারিস্টার হয়ে ১৯২৭ সালে দেশে ফিরে আসেন। মাত্র ৩৩ বছর বয়সে ১৯৩৪ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৮ সালে পরপর দুটো টার্ম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন। এত অল্প বয়সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়ে যে অসামান্য দক্ষতায় কর্ম পরিচালনা করেছিলেন তা বিস্ময়কর।

সেই সময় ভারতবর্ষ জুড়ে নানারকম আন্দোলনে জেরবার হয়ে ব্রিটিশ সরকার ঠিক করে, ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের ১১টি প্রদেশে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রাদেশিক সরকার গঠন করে ব্রিটিশ ক্রাউনের অধীনে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার এদেশের রাজনৈতিক দলগুলিকে দেওয়া হবে। সেই মতো ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অবিভক্ত বাংলায় তখন এ কে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গে মহম্মদ আলি জিন্নার মুসলিম লিগের কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়েছিল। কারণ ওই দুটি দলই ছিল মুসলমানদের দল, আর অবিভক্ত বাংলায় তখন মুসলমান জনসংখ্যা ছিল হিন্দুদের থেকে প্রায় ৮ শতাংশ বেশি। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী Calcutta University Constituency থেকে বাংলার প্রাদেশিক সভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন।

কৃষক প্রজা পার্টি ও মুসলিম লিগের কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার প্রধান মন্ত্রী হয়েছিলেন কৃষক প্রজা পার্টির নেতা এ কে ফজলুল হক। বাংলার প্রাদেশিক সরকারের অংশীদার হয়ে, সরকারি ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে মুসলিম লিগ নেতারা ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় দফায় দফায় দাঙ্গা সংগঠিত করে। হিন্দুদের মন্দির অপবিত্র করে, হিন্দুদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে, হিন্দু নারীদের শ্লীলতা হানি করে নারকীয় অত্যাচার করেছিল মুসলিম লিগ। শ্যামাপ্রসাদ পূর্ববঙ্গের দাঙ্গাপীড়িত এলাকায় ছোটাছুটি করে হিন্দুদের পাশে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। তিনি দেখলেন সরকারি ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে মুসলিম লিগ নানারকম ভাবে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করছে। কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টির মতো রাজনৈতিক দলগুলি হিন্দুদের উপর মুসলিম লিগের অন্যায় অত্যাচার মুখ বুজে মেনে নিচ্ছে মুসলমানদের তোষণ করে তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার আশায়। কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য না হওয়ার কারণে বিশেষ কিছুই করে উঠতে পারছিলেন না শ্যামাপ্রসাদ। তখন প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার কথা তিনি চিন্তা করলেন।

তিনি হিন্দু মহাসভায় যোগদান করেন। ১৯৪০ সালে নিখিল ভারত হিন্দুমহাসভার কার্যকরী সভাপতি হন। ১৯৪০ সালে তিনি বঙ্গীয় হিন্দুমহাসভার সভাপতিও হন। এদিকে ১৯৪০ সালে মুসলিম লিগ লাহোর অধিবেশনে মুসলমানদের জন্য আলাদা দেশ পাকিস্তানের প্রস্তাব পাশ করে।

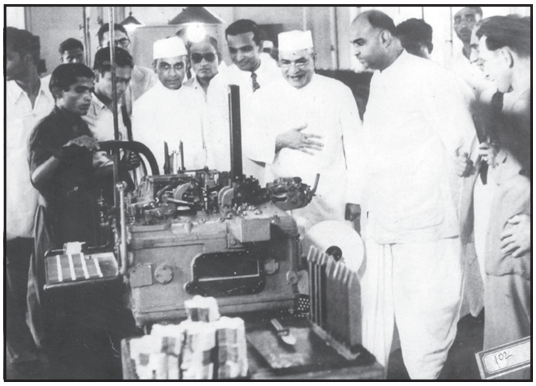

কারখানার যন্ত্রপাতি পরিদর্শন করছেন শিল্পমন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ।

১৯৪১ সাল নাগাদ ফজলুল হকের সঙ্গে জিন্নার সম্পর্কের অবনতি হয়। শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে ফজলুল হকের ভাল পরিচয় ছিল, কারণ ফজলুল হক প্রথম জীবনে শ্যামাপ্রসাদের পিতা স্যার আশুতোষের অধীনে জুনিয়র ল'ইয়ার ছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ জানতেন ফজলুল হক কট্টরপন্থী মুসলমান নন; তাঁকে যদি প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্যের সমর্থন জোগাড় করে দেওয়া যায় যাতে তিনি প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারেন তাহলে তিনি জিন্নার মুসলিম লিগের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। শ্যামাপ্রসাদ কৌশলে এই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে সাম্প্রদায়িক মুসলিম লিগকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চাইলেন। তখন বাংলার

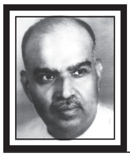

কংগ্রেসের একটি গোষ্ঠী ছিল যারা খাদি কংগ্রেস বলে পরিচিত। শ্যামাপ্রসাদ এঁদের সমর্থন আদায় করলেন; কিছু অকংগ্রেসি সদস্যেরও সমর্থন জোগাড় করতে সমর্থ হন। ফজলুল হক মুসলিম লিগের সঙ্গে কোয়ালিশন ছিন্ন করে এঁদের সমর্থনে নতুন সরকার গঠন করলেন। নতুন কোয়ালিশনের নাম হলো প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন। অনেকে বলতো শ্যামা-হক কোয়ালিশন। ফজলুল হক ড. শ্যামাপ্রসাদকে এই নতুন কোয়ালিশন মন্ত্রীসভায় অর্থমন্ত্রী করেছিলেন। তখন বাংলার গভর্নর ছিলেন জন হারবার্ট। মুসলিম লিগ ছিল তাঁর পছন্দের দল। কাজেই শ্যামা-হক মন্ত্রীসভার গঠনে তিনি বেজায় অখুশি হলেন। এই মন্ত্রীসভা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। পরবর্তীকালে গভর্নর হারবার্ট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং সেইসঙ্গে ৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের পটভূমিকায় নানারকম অজুহাতে এই মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করে তাঁর পছন্দের মুসলিম লিগকে আবার সরকারে বসিয়ে ছিলেন ১৯৪৩ সালে।

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হলো তার ফলে ব্রিটিশের পক্ষে ভারতবর্ষকে কলোনি বানিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে উঠল। ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়ার মনস্থ করল এবং ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে ক্যাবিনেট মিশনকে ভারতে পাঠাল ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়টি খতিয়ে দেখতে। মুসলিম লিগ মুসলমানদের জন্য আলাদা দেশ পাকিস্তানের দাবিতে অনড় হয়ে রইল। কংগ্রেস, হিন্দুমহাসভা ইত্যাদি অন্য রাজনৈতিক দলগুলি ভারত ভাগ চাইছিল না। কমিউনিস্টরা অবশ্য পাকিস্তান দাবির পক্ষে সওয়াল করেছিলেন।

এদিকে ১৯৪৬ সালের এপ্রিলের নির্বাচনে অবিভক্ত বাংলায় মুসলিম লিগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে প্রাদেশিক সরকার গঠন করল। তখন সুরাবর্দি হলেন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী। পাকিস্তানের দাবিপূরণের ব্যাপারে অন্য দলগুলির অনীহা দেখে মুসলিম লিগ ১৯৪৬ সালের ২৯ জুলাই একটি সিদ্ধান্ত নিল যে তাদের পাকিস্তানের দাবি মেনে না নিলে তারা ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট ডাইরেক্ট অ্যাকশান করবে। জিন্নার ডাইরেক্ট অ্যাকশান আসলে ছিল ইসলামিক দেশ গঠনের উদ্দেশ্যে মুসলমানদের জিহাদ। গান্ধীজী জিন্নাকে নানারকম ভাবে তোয়াজ করে সমস্যার সমাধান করতে চাইলেন কিন্তু তাতে কোনো কাজ হলো না। কংগ্রেস নেতাদের টালবাহানার মধ্য দিয়ে ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট এসে গেল। বাংলার মুসলিম লিগ প্রধানমন্ত্রী তলায় তলায় সমস্ত ব্যবস্থা করে রেখেছিল। ১৬ আগস্ট সকাল থেকেই কলকাতার বুকে আরম্ভ হয়ে গেল মুসলিম লিগের ডাইরেক্ট অ্যাকশান নামক ভয়াবহ হিন্দু নিধন যজ্ঞ। শত শত হিন্দু হত্যা করে, হিন্দুদের দোকানপাট-ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে, হিন্দু নারীদের শ্লীলতাহানি করে তিনদিন ধরে চলল নরমেধ যজ্ঞ— সমস্ত কলকাতা জুড়ে। ইতিহাসে এরকম ঘটনা বিরল। ইতিহাসে এই ঘটনা The Great Calcutta Killing নামে পরিচিত হয়ে আছে। এতবড় হত্যাকাণ্ড করেও কোনো রফা হলো না দেখে মুসলিম লিগ নেতারা ১৯৪৬ সালের ১০ অক্টোবর, কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার দিন পূর্ববঙ্গের নোয়াখালিতে হিন্দু নিধন আরম্ভ করলো। মুসলিম লিগের সদস্যরা গ্রামের পর গ্রামে হিন্দুদের দোকানপাট, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে, হিন্দুদের মন্দির ধ্বংস করে, হিন্দু পুরুষদের হত্যা করে, হিন্দু নারীদের ধর্ষণ করে নরকের রাজত্ব কায়েম করেছিল। নোয়াখালিতে মুসলিম লিগ ব্যাপক হারে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করেছিল। প্রায় দু-তিন সপ্তাহ ধরে নারকীয় অত্যাচার করে নোয়াখালি ও ত্রিপুরার হিন্দুদের পশুর স্তরে নামিয়ে এনেছিল মুসলিম লিগ। কংগ্রেসের তুলনায় হিন্দুমহাসভা তখন একটি ছোট দল। ড. শ্যামাপ্রসাদ তাঁর সীমিত ক্ষমতা নিয়ে নোয়াখালির হিন্দুদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।

মুসলিম লিগের এই ভয়াবহ বিধ্বংসী রূপ দেখে, অবশেষে মুসলিম লিগের পাকিস্তানের দাবি কংগ্রেস মেনে নিল। এবার মহম্মদ আলি জিন্না মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা হেতু পুরো বাংলাকেই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলেন। নেহরু-গান্ধীজীর আপত্তি ছিল না। গর্জে উঠলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ। তিনি বুঝলেন পুরো বাংলা পাকিস্তানে গেলে ইসলামি ব্যবস্থায় বাঙালি হিন্দুদের অস্তিত্ব লোপ পাবে। তাই তিনি দাবি করলেন বাংলার হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাগুলোকে আলাদা করে ভারতভুক্ত করতে হবে, বাঙালি হিন্দুদের বাসভূমি হিসেবে। একই ভাবে শিখদের জন্যও পঞ্জাবের একটি অংশ ভারতভুক্ত করতে হবে। তিনি এই দাবির পক্ষে তীব্র আন্দোলন সংগঠিত করলেন। বাংলার বড় বড় ব্যক্তিত্বরা ড. শ্যামাপ্রসাদের পক্ষে দাঁড়ালেন। বাঙালি হিন্দুদের বাসভূমি হিসেবে আলাদা ভূখণ্ডের দাবিতে বাংলা জুড়ে ৭৬টি জনসভা করে সারা বাংলা তোলপাড় করে দিয়েছিলেন তিনি। অবশেষে শ্যামাপ্রসাদের দাবি মেনে নেওয়া হলো এবং বাংলা ভাগ করে হলো পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গ। পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলো এবং পশ্চিমবঙ্গ বাঙালি হিন্দুদের বাসভূমি হিসেবে ভারতভুক্ত হলো। একইভাবে পঞ্জাবও ভাগ হলো। একটি অংশ ভারতভুক্ত হলো। এইভাবে রক্তপাত ও দেশভাগের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ স্বাধীন হলো ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট।

ড. শ্যামাপ্রসাদ যে অনমনীয় দৃঢ়তায় আন্দোলন করে জিন্নার থাবা থেকে বাংলা ও পঞ্জাবের অংশ ছিনিয়ে আনলেন তার জন্য পশ্চিমবঙ্গের অনেক কংগ্রেস নেতার কাছেও তিনি গ্রহণীয় হয়ে উঠেছিলেন। তার ফলে কংগ্রেস নেতাদের সমর্থন পেয়ে হিন্দুমহাসভার নেতা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী পশ্চিমবঙ্গ থেকে স্বাধীন ভারতের con-

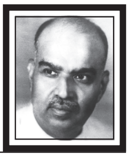

stituent Assembly-তে মনোনীত হয়ে গেলেন। স্বাধীন ভারতের প্রথম মন্ত্রীসভায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর পেলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। নেহরু মন্ত্রীসভায় তিনি হয়েছিলেন শিল্প ও সরবরাহ দপ্তরের মন্ত্রী।

স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম শিল্পমন্ত্রী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। খুবই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। দায়িত্ব পেয়েই বিপুল উদ্যমে ভারত নির্মাণে লেগে গেলেন তিনি। একদম প্রথম থেকেই শিল্প ও সরবরাহ দপ্তরে তাঁর কর্তৃত্ব তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে সদ্য স্বাধীন হওয়া ভারতবর্ষের মতো অনুন্নত দেশে শিল্পের প্রসার করতে গেলে বেসরকারি পুঁজির ব্যবহার করতেই হবে। কমিউনিস্টদের মতো পুঁজির মালিকদের শ্রেণীশত্রু ভাবলে হবে না।

তিনি ঠিক করলেন রাষ্ট্রের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে থাকবে পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান ও শিল্প, অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান ও শিল্প, রেলওয়ে, রিভার ভ্যালি প্রজেক্ট হবে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে। অন্য শিল্পগুলো যেমন— ফার্টিলাইজার, কটন ও উলেন টেক্সস্টাইল, পেপার ও নিউজপ্রিন্ট ইত্যাদি বেসরকারি উদ্যোগে হবে। অর্থাৎ মিশ্র অর্থনীতি নির্ভর শিল্প চেয়েছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ। প্রধানমন্ত্রী নেহরুও তাই চেয়েছিলেন। ১৯৪৮ সালের ৬ এপ্রিল মিশ্র অর্থনীতি নির্ভর শিল্পনীতি ঘোষণা করলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম শিল্পমন্ত্রী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী।

শিল্পের মালিকদের শ্রেণীশত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে দিয়ে শ্রমিকদের মন বিষিয়ে দেওয়ার যে আন্দোলন কমিউনিস্টরা করত ড. শ্যামাপ্রসাদ তার বিরোধী ছিলেন। তিনি মনে করতেন এতে শিল্প মার খাবে এবং শ্রমিকেরও কোনো উপকার হবে না। শ্রমিকরা যাতে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সুযোগসুবিধা, কর্মক্ষেত্রে সেফটি, ওয়েলফেয়ার সংক্রান্ত অন্য সুযোগসুবিধা পেতে পারে, সেসব নিয়মকানুন বিধিবদ্ধ করে তিনি Factories Act, 1948 চালু করেছিলেন।

ড. মুখার্জী সঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, সরকারি আমলাদের দ্বারা পরিচালিত সরকার-নিয়ন্ত্রিত শিল্পগুলি, মাথাভারী প্রশাসনের দরুন ও অতিরিক্ত নিয়মকানুনের বেড়াজালে সঠিক দক্ষতায় চলতে পারবে না। সেইজন্য তিনি সরকার-নিয়ন্ত্রিত শিল্পগুলির পরিচালনার ক্ষেত্রে জয়েন্ট-স্টক-কোম্পানির আদলে কর্পোরেশন গঠনের কথা ভাবলেন, যেখানে বোর্ড অব ডিরেক্টরদের মধ্যে সরকার মনোনীত ডিরেক্টরদের সঙ্গে বেসরকারি শিল্পপতিরাও থাকবেন। পরবর্তীকালে দেখা যায় ড. শ্যামাপ্রসাদের এই ভাবনাটাই পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং চালাবার উপায় হিসেবে গ্রহণীয় হয়েছিল।

Cottage and Small scale Industries-এর উন্নতির জন্য ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০-এর মধ্যে তিনি All India Handicrafts Board, All India Handloom Board এবং Khadi and Village Industries Board তৈরি করেন। শিল্প সংস্থাগুলো যাতে আর্থিক ঋণ নিতে পারে তার জন্য ১৯৪৮ সালে তৈরি করা হয় Industrial Finance Corporation of India (IFCI)।

সরকারি শিল্পনীতি অনুযায়ী যেসব শিল্প তিনি স্থাপন করেছিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— Chittaranjan Locomotive Works (W.B.), Hindustan Aircraft Factory (Bangalore), Sindri Fertilser Factory (Bihar)। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য কাজ হলো— Damodor River Vally Project. দামোদর নদের কারণে বাংলা, বিহার জুড়ে ভীষণ বন্যা হোত। এর থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার জন্য ১৯৪৮ সালে ড. মুখার্জী গঠন করলেন Damodor Valley Corporation. এটি হলো একটি বহুমুখী প্রকল্প। দামোদর নদের উপর বাঁধ দিয়ে শুধু বন্যা নিয়ন্ত্রণ হবে তাই নয়, এই প্রজেক্টের মাধ্যমে সেচের সুবিধা হবে, বিদ্যুৎ তৈরি হবে, বনসৃজন করা হবে, জল-পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে ইত্যাদি। এটি ছিল কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য (বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ) সরকারের একটি মিলিত উদ্যোগে।

স্বাধীন ভারতের শিল্প গঠনের কর্মযজ্ঞে প্রচুর লোহা ও ইস্পাতের প্রয়োজন। সেই কথা মাথায় রেখে তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় যেসব ইস্পাত কারখানা গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছিলেন সেগুলো হলো— Bhilai Steel Plant (M.P.), Durgapur Steel Plant (W.B.), Rourkela Steel Plant (Orissa)। তিনি শিল্পমন্ত্রী থাকতে থাকতেই National Newsprint and Paper Mills Ltd. (Nepa Nagar) তৈরি করার প্রাথমিক কাজ শুরু করে দিয়ে গিয়েছিলেন, ১৯৫৪ সালে তার থেকে Production শুরু হয়েছিল। ওড়িশার মহানদীর উপর Hirakud Dam Project তিনি শুরু করে দিয়েছিলেন ১৯৪৮ সালে।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী শিল্পমন্ত্রী থাকাকালীন Woollen Handloom Industries, Cotton Handloom Industries, Cotton Textile Industries-এর উন্নতির জন্যও কাজ করেছিলেন। এই সমস্ত শিল্পগুলি সরকারি সহায়তায় নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে যাতে বাণিজ্যিক ভাবে সফল হতে পারে তার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি আলিগড়ের কাছে তৈরি করেছিলেন General Institute of Cottage Induatries। সেখানে Instructor, Master-Weaver-দের অধিক উৎপাদনের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেই সময়ের বিচারে ভারতের Cotton Textile Industries প্রায় ১৫০

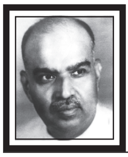

বছরের পুরনো, সেখানে প্রায় ১২৭ কোটি টাকার পুঁজি খাটতো এবং প্রায় সাত লক্ষ লোক কাজ করতো। এই ইন্ডাস্ট্রির তখন বেশ খারাপ অবস্থা। এই ইন্ডাস্ট্রির উন্নতির জন্য ড. মুখার্জী ১৯৪৮ সালের ৩০ জুলাই নতুন Textile Policy ঘোষণা করলেন— যার সাহায্যে বস্ত্রের মূল্য, উৎপাদন ও বন্টন ইত্যাদি সঠিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে শিল্পটিকে লাভজনক করার ব্যবস্থা করা হলো। সুতি বস্ত্র ও সুতোর বিদেশে রপ্তানি, টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি সংক্রান্ত কারিগরি শিক্ষা ও গবেষণা ইত্যাদি তদারকি করার জন্য Cotton Textile Fund Ordinance (1944)-এর আওতায় Cotton Textile Fund Committee নিয়োগ করেছিলেন তিনি। চালু করেছিলেন Textile Research Institute এবং তার জন্য বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞও খুঁজে এনেছিলেন।

শুধু সরকারি শিল্প নয়, বেসরকারি শিল্পের বিকাশের ব্যাপারেও তিনি ছিলেন একই রকম আন্তরিক। এ ব্যাপারে তৎকালীন বিখ্যাত সুইডিশ দেশলাই কোম্পানি WIMCO-র কথা বলা যেতে পারে। ১৯২৬ সাল থেকে এই কোম্পানিটি ভারতের বিভিন্ন জায়গায়— যেমন— অম্বরনাথ, মাদ্রাজ, বেরিলি, কলকাতা, ধুবড়ি ইত্যাদি জায়গায় ২০০টি Cottage Industry-র মাধ্যমে তাদের উৎপাদন করত, তবে বেশির ভাগটাই হোত মাদ্রাজের শিবকাশিতে। দেশভাগের গোলমালের ফলে পশ্চিম পাকিস্তানে WIMCO-র বাজার খুব খারাপ হয়ে যায় এবং এর বেশিরভাগ প্রভাবই গিয়ে পড়ে মাদ্রাজের শিবকাশির অন্তর্গত Cottage Industry গুলোর উপর এবং এর ফলে WIMCO শিবকাশির অংশটিতে লোকসানের ছায়া পড়ে। ওখানকার শ্রমিকরা সমস্যায় পড়ে যায়। ড. শ্যামাপ্রসাদের হস্তক্ষেপে তারা এই সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিল। ড. শ্যামাপ্রসাদ মাদ্রাজ সরকারকে নির্দেশ দিলেন যে Cottage Industry গুলোকে নিয়ে Co-operative Organisation তৈরি করে তাদের অর্থ সাহায্য করে, কাঁচামাল সরবরাহ করে, উৎপাদিত দ্রব্য বণ্টনে সহায়তা করে সঙ্কট কাটিয়ে তোলবার ব্যবস্থা করতে। এবং তাঁর নির্দেশিত পন্থা অবলম্বন করে তারা ৯০ শতাংশ সংকট কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিল।

এইভাবে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে শিল্প সরবরাহ মন্ত্রীর কাজ করে চলেছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। কিন্তু এই কাজ তিনি বেশিদিন চালিয়ে যেতে পারেননি। কারণ এইসময় ১৯৫০ সালে আবার পূর্ব বাংলায় (পূর্ব পাকিস্তান) শুরু হয়ে গেল হিন্দু নিধন যজ্ঞ। পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে প্রায় ৫০ হাজার হিন্দুকে হত্যা করা হয়। লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর পুনর্বাসনের কী ব্যবস্থা হবে তাই নিয়ে উঠে পড়ে লাগলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে Population Exchange-এর প্রস্তাব দিলেন। ড. বি আর আম্বেদকার, কে হনুমন্তইয়া ড. শ্যামাপ্রসাদের প্রস্তাবের সঙ্গে সহমত ছিলেন। নেহরু এসব কথা কিছু শুনলেন না। চাপে পড়ে একটা কিছু ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে তিনি পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানকে আমন্ত্রণ করে এনে উভয় দেশের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার জন্য একটি চুক্তি করলেন যা 'নেহরু- লিয়াকত চুক্তি' নামে খ্যাত। নেহরু-লিয়াকত চুক্তির শর্তাবলী অনুধাবন করে ড. শ্যামাপ্রসাদ বুঝেছিলেন এই চুক্তির ফলে ভারতের মুসলমানদের সুবিধা হবে কিন্তু পাকিস্তানে (পূর্ব ও পশ্চিম) বসবাসকারী হিন্দুদের নিরাপত্তার কোনোই সুবিধা হবে না। কারণ ইসলামিক রাষ্ট্রে অন্য ধর্মের লোকের কোনোই অধিকার নেই। ড. শ্যামাপ্রসাদ এই চুক্তির তীব্র প্রতিবাদ করে নেহরু মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন ১৯৫০ সালের ৬ এপ্রিল। পরে ১৯৫১ সালের ২১ অক্টোবর, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ভারতীয় জনসঙ্ঘ নামে একটি রাজনৈতিক দল তৈরি করেন যা পরবর্তীকালে ভারতীয় জনতা পার্টি নামে পরিচিতি লাভ করে। ওই সময় আরও একটি ভয়ানক সমস্যা তৈরি হয়। কাশ্মীর সমস্যা। কাশ্মীরের ভারতভুক্তির পরে ওখানকার নেতা শেখ আবদুল্লা কাশ্মীরকে একটি আলাদা মুসলমান দেশের মতো চালাবার পরিকল্পনা করলেন এবং সেই কারণে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর মদতে তিনি জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের জন্য আলাদা সংবিধান, আলাদা প্রধান, আলাদা পতাকা এবং আলাদা শীর্ষ আদালত চালু করতে সচেষ্ট হলেন। তার বিরুদ্ধে ওখানকার কাশ্মীরি হিন্দুরা তীব্র আন্দোলন শুরু করলেন। ড. শ্যামাপ্রসাদ ভারতীয় জনসঙ্ঘের তরফে আওয়াজ তুললেন 'এক দেশমে দো বিধান, দো প্রধান, দো নিশান নহী চলেগা'। তিনি তাঁদের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে শেখ আবদুল্লার সঙ্গে আলাপ- আলোচনা করবার উদ্দেশে ১৯৫৩ সালের মে মাসে কাশ্মীরে গেলেন। দিনটা ছিল ১৯৫৩ সালের ২১ মে। কাশ্মীরের পুলিশ ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে গ্রেপ্তার করল। বন্দি অবস্থায় অসুস্থ হয়ে ১৯৫৩ সালের ২৩ জুন ভোরবেলায় কাশ্মীরে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী মারা যান। অনেকে মনে করেন নেহরু ও শেখ আবদুল্লার ষড়যন্ত্রেই মারা গেছেন ড. শ্যামাপ্রসাদ। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ড. শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর তদন্ত দাবি করেছিলেন। কিন্তু কোনো তদন্ত করাননি নেহরু। ভারতমাতার মহান সন্তান, পশ্চিমবঙ্গের জনক ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী তাঁর মর্যাদার সঠিক আসনটি এখনো পাননি।

তথ্যসূত্র :

(১) The Life and Times of Dr. Shyamaprasad Mookerjee–by Tathagata Roy. (২) 1946 The Grat Calcutta Killings And Noakhali Genocide–by Dr. Dinesh Chandra Sinha, Ashok Dasgupta, Ashis Chowdhury. (৩) বাঙালির পরিত্রাতা শ্যামাপ্রসাদ—ড. দীনেশ চন্দ্র সিংহ।

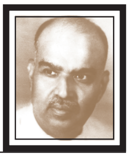

নজরুল-দরদি শ্যামাপ্রসাদ

অভিজিৎ দাশগুপ্ত

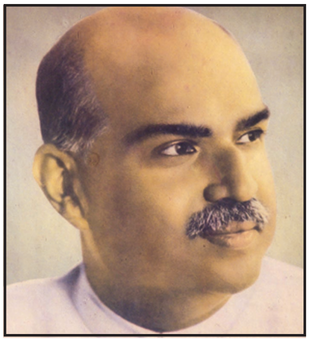

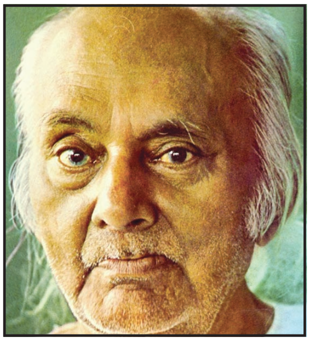

কাজী নজরুল ইসলাম যতদিন স্বমহিমায় সৃষ্টিশীল ছিলেন, ততদিন তাঁর বন্ধুবান্ধব অনুরাগীর কোনো অভাব ঘটেনি। অসামান্য দীপ্ত চেহারা, টানা টানা চোখ আর দরাজ গলায় তাঁর উপস্থিতির মধ্যেই এমন জাদু ছিল যে, ভক্ত-অনুরাগীর দল প্রায় যেন আচ্ছন্ন হয়ে যেতেন। কবিতা পাঠের আসরে একের পর এক কবিতা পড়ছেন, ঘরোয়া সঙ্গীতের আসরে হারমোনিয়াম টেনে পরপর গেয়ে চলেছেন নিজের লেখা আর সুর করা গান, রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এমন সম্মোহনী শক্তি সে যুগে অন্য কারও ছিল কিনা বলা শক্ত। কিন্তু এমন প্রাণমাতানো সৃষ্টিশীল মানুষকে এত মর্মান্তিক কিছু আঘাত পেতে হলো, যা হয়তো শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবনটাকেই নষ্ট করে দেয়।

নজরুলের বিরাট বন্ধুমহলের একাংশের অভিযোগ ছিল, তিনি একসময়ে হাজার হাজার টাকা রোজগার করেছেন। কিন্তু পরিবার আর ভবিষ্যতের কথা না ভেবে সে টাকা স্রেফ ফুঁকে উড়িয়ে দিয়েছেন। এই অভিযোগ কতদূর সত্যি, তা আর জানার উপায় নেই। কিন্তু ১৯৪২ সালে কবি যখন অজানা রোগে আক্রান্ত হলেন, বাস্তব আর অলীক জগতের মাঝে পেন্ডুলামের মতো দুলতে শুরু করল তাঁর চেতনা, তখন অভিযোগটা আরও ফুলে ফেঁপে উঠল। কেউ কেউ তো প্রকাশ্যেই বলতে লাগল তাঁর আজকের দারিদ্র্যের জন্য নজরুলই দায়ী। কী করে এঁরা বুঝবেন, বড় ছেড়ে বুলবুল যখন গুটিবসন্তে আক্রান্ত হয়ে চোখের সামনে চলে গেল, তখন রোগ নিরাময়ের জন্য আপ্রাণ খরচ করে গিয়েছিলেন বাবা নজরুল। কিন্তু কিছুতেই কিছু করা যায়নি। চোখের মধ্যেও বসন্তের গুটি বার হয়েছিল বুলবুলের, বাবাকে কাছছাড়া করতে চাইত না এক মুহূর্ত। বয়স তখন তার মাত্র চার। এই অবস্থাতেই ১৯৩০ সালের মে মাসে মারা যায় বুলবুল। নজরুলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু কমরেড মুজাফ্ফর আহমেদ লিখেছেন : 'উস্তাদ জমীরুদ্দিন খানের সঙ্গে নজরুলের যখন সঙ্গীত চর্চা চলত, তখন শুনে শুনেই সব শিখে ফেলত ছোট্ট বুলবুল। এমন দুরন্ত ছিল তার স্মৃতিশক্তি। আহা, অন্ধ হয়েও বুলবুল যদি বেঁচে থাকত। তাহলে একজন বড় গায়ক ও সঙ্গীতজ্ঞ তো সে হতে পারত।'

দ্বিতীয় আঘাত স্ত্রী প্রমীলার নিরাময়ের অতীত অসুখ। যার জেরে বাকি জীবনটা তাঁকে শয্যাশায়ী হয়েই কাটাতে হয়েছে। চিকিৎসায় কোনো কার্পণ্য করেননি নজরুল। খরচ করেছেন হাজার হাজার টাকা। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন দাঁড়াল যে মাত্র চার হাজার টাকায় অসীমকৃষ্ণ দত্তর কাছে যথাসর্বস্ব বাঁধা দিতে হয়েছিল নজরুলকে। অবশেষে এল তৃতীয় ধাক্কা। বিচিত্র অসুখে আক্রান্ত হলেন কবি নিজেই। ১৯৪২ সাল। জুলাই মাস। হঠাৎ একদিন তিনি অনুভব করলেন জিব আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ডান হাতটা কাঁপছে। শরীর নির্জীব, নিস্তেজ। নিম্নাঙ্গ অসাড় হয়ে যাওয়া স্ত্রীর শয্যাপাশে তিনি পড়ে রইলেন সারাদিন, যেন ওঠার শক্তিও নেই। নজরুলের অনুজপ্রতিম সুহৃদ জুলফিকার হায়দার প্রায়ই বাড়ি আসতেন। তিনি এসে অনেকক্ষণ লক্ষ্য করে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। রোগ দেখে তো মনে হচ্ছে প্যারালিসিস। তাহলে এখন উপায়?

আরও কয়েকদিন গেল। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করছিলেন প্রতিবেশী এক ডাক্তার। কিন্তু উন্নতির কোনও লক্ষণ নেই। প্রমীলাদেবীর মা গিরিবালা দেবীর সঙ্গে আলোচনা করে হায়দার সাহেব কবির অসুখের খবরটি সংবাদপত্রে পাঠিয়ে দিলেন। ইংরেজি, বাংলা প্রায় প্রত্যেকটি দৈনিকেই খবরটি গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হলো। তাঁরা ভেবেছিলেন, অসুখের খবর পেয়ে কাজী নজরুলের বন্ধু-অনুরাগী মহলে নিশ্চয়ই একটা সাড়া পড়ে যাবে, সবাই দেখতে আসবে। পাঁচজনে মিলে তখন ঠিক করা যাবে কোনপথে চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করা যায়। কিন্তু অপেক্ষাই সার। দিনের পর দিন কেটে গেল, কবির বন্ধুবান্ধবদের কাউকেই তাঁর বাড়ির ধারে-কাছে দেখা গেল না।'

জুলফিকার সাহেব লিখছেন : 'আমি যখন কাজীদার বাসায় গিয়ে পৌঁছই, তখন সকাল এগারোটা বেজে গেছে। ভাবী বললেন, জিবের আড়ষ্টতা আরও বেড়ে চলেছে। কি জানি কেন সকাল থেকেই তিনি খুব উত্তেজিত, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ক্রোধের সঙ্গে কী যেন বলছেন। হায়দার সাহেবকে দেখে নজরুল জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, 'তুমি এখনই ফজলুল হকের ভাগ্নে ইউসুফের ওখানে চলে যাও। তাকে তো তুমি চেনোই, ইউসুফকে নিয়ে তুমি হক সাহেবের কাছে যাও। গিয়ে বলো, 'নবযুগ' কাগজের

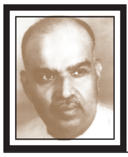

খাটুনিতেই (নবযুগ পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ছিলেন কাজী নজরুল) আজ আমি এই অসুখে পড়েছি। তিনি আমার সঙ্গে মোটেই ভাল ব্যবহার করেননি। যেমনটি আশা করেছিলাম সেরকম কিছুই পাইনি।'

বলতে বলতে আরও উত্তেজিত হয়ে উঠলেন নজরুল। সামনে খাবার দেওয়া হয়েছিল, টান মেরে ফেলে দিলেন। ঘরের সকলে চুপচাপ। যে যার জায়গায় বসে আছেন। এই অবস্থায় হায়দার উঠে এসে কবিকে বললেন, 'হক সাহেবের কাছে আমি যাচ্ছি। কিন্তু আপনি দুটো খেয়ে নিন, নইলে যাব না।' মিনিট দশেক চিৎকার-চেঁচামেচি করে অবশেষে একটু যেন শান্ত মনে হলো কবিকে। ভাতের থালা আনা হলো। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারেও কেমন একটা অস্বাভাবিকতা। ঠিক উন্মাদের মতোই তাড়াহুড়ো করে খাচ্ছেন। কখনও আবার বাঁ হাতে গ্রাস তুলে মুখে পুরছেন। মাসিমা গিরিবালা দেবী কাঁটা বেছে না দিলে মাছের কাঁটা বেছে খাওয়ার ক্ষমতাও তাঁর লোপ পেয়ে গিয়েছিল।

অবশেষে সেদিন বিকেলেই জনাব ইউসুফ আলির বাসায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন হায়দার সাহেব। সৌজন্য বিনিময়ের পর বললেন, 'ইউসুফ সাহেব, বন্ধু হিসাবে আপনার এবং আপনার স্ত্রী কবি মোতাহেরা বানুর কাছে কাজীদার দাবি, আপনি স্বয়ং ফজলুল হকের কাছে গিয়ে কবির আর্থিক দুরবস্থার কথা তাঁকে জানান, যাতে তিনি চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারেন।'

কবির অসুখের কথা শুনেও খানিকটা নির্বিকার ইউসুফ আলি। বললেন, হক সাহেব তো খুব ব্যস্ত থাকেন। গেলেই তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাওয়া যাবে—এমনটা হওয়া কঠিন। ছাড়লেন না হায়দার। বেশ জোরের সঙ্গে বললেন, 'আমি কাল সকাল আটটার সময় হক সাহেবের কাছে যাচ্ছি এবং আপনাকেও সঙ্গে চাই।' অগত্যা রাজি হলেন ইউসুফ আলি।

৮৮/২, ঝাউতলা রোড। এই বাড়িতেই থাকতেন জনাব ফজলুল হক। ব্রিটিশ আমলে অবিভক্ত বাংলার 'চিফ মিনিস্টার'। এত সকালেও তাঁর বাসভবনের বৈঠকখানায় এমপি এমএলএদের ঠাসাঠাসি ভিড়। হক সাহেব তখনও দরবারে বসেননি। যাঁরা এসেছেন তাদের মধ্যে গল্পগুজব চলছে। ইউসুফ সাহেবের সঙ্গে সোজাসুজি প্রাইভেট চেম্বারে ঢুকে গেলেন হায়দার। ফজলুল সাহেবকে পাওয়াও গেল। ইউসুফ আলি সংক্ষেপে কবির অসুস্থতার কথা তাঁকে জানিয়ে বললেন, চিকিৎসার ব্যবস্থা এখনও কিছুই হয়নি। একটা কিছু ব্যবস্থা তো করতে হয়।

হক সাহেব হায়দারের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি কাল সকাল আটটার সময় আবার এসে আমাকে মনে করিয়ে দেবে। এখন আমি কিছুই বলতে পারছি না।

পরের দিন ১৯ জুলাই ১৯৪২। হক সাহেব যেমন বলেছিলেন সেই মতো নির্দিষ্ট সময়ে হাজির জুলফিকার হায়দার। কিন্তু গিয়েই তো চক্ষুস্থির। অন্তত পঞ্চাশ-ষাটজন এমএলএ চিফ মিনিস্টারকে ঘিরে বসে আছেন। জমে উঠেছে খাস দরবার। হক সাহেব অবশ্য একাই বক্তা। বাকিরা সবাই শ্রোতা। হায়দারকে দেখে ইশারায় বসতে বললেন। কিন্তু ওই পর্যন্তই। সময় আর হয় না। অতি কষ্টে যখন চিফ মিনিস্টারের নাগাল পাওয়া গেল তখন ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে। নিজের চেম্বারে ঢুকেই নুরুল হুদাকে নির্দেশ দিলেন, 'শিগগির শ্যামাপ্রসাদকে ফোনে কন্ট্রাক্ট করো।'

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি তখন অবিভক্ত বাংলার অর্থমন্ত্রী।

—হ্যালো শ্যামাপ্রসাদ শোনো। কবি নজরুল ইসলাম অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। যতটুকু শুনলাম, মনে হচ্ছে প্যারালিসিস। ডাঃ বিধান রায়কে দেখাবার জন্য আমাকে এসে ধরেছে। তুমি একটু বিধান রায়কে দেখাবার ব্যবস্থা করে দাও।

মুখ্যমন্ত্রীর ফোন পেয়ে শ্যামাপ্রসাদ বিধান রায়ের একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দিতেই পারতেন। কিন্তু স্যার আশুতোষের এই মেজো ছেলেটি যে ধাতুতে গড়া, তাতে এক বিপন্ন কবিকে সামান্য উপকার করে দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলার মানুষ তিনি ছিলেন না। ফজলুল হক হায়দার সাহেবকে বলেছিলেন পরদিন লালদিঘির সেক্রেটারিয়েটে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। হায়দার যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে শুনলেন, হক সাহেব জরুরি কাজে কোথায় যেন বেরিয়ে গেছেন। বিমূঢ় হায়দার শেষমেষ নজরুল ইসলামের কথা উল্লেখ করে একটা স্লিপ লিখলেন। কাগজটা আর্দালির হাতে দিয়ে বললেন, 'দেখো তো, ডক্টর মুখার্জি যদি থাকেন, তবে ওটা তাঁর হাতে গিয়ে দাও।' আর্দালি স্লিপ নিয়ে ডক্টর মুখার্জির ঘরে ঢুকল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এসে বলল, 'চলুন, সাহেব ডাকছেন।' নিজের ডেপুটি সেক্রেটারি মিস্টার ওয়াকারের সঙ্গে কথা বলছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। হায়দার ঢুকতেই তাঁকে বললেন, 'আধ ঘণ্টা পর ফের চলে আসুন।' টেবিলে আর একজন বসেছিলেন। চট্টগ্রামের এমএলএ ড. সানাউল্লা। শ্যামাপ্রসাদ তাকেও সবিনয়ে বিদায় করলেন। তারপর টেবিলে কনুই দিয়ে সামনে ঝুঁকে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে বললেন, 'হ্যাঁ এবার বলুন আপনি, কবির অবস্থা কি খুব খারাপ? কবে থেকে অসুখ? কী অসুখ?' হায়দারের কাছে কবির অসুস্থতার বিবরণ শুনে বিমর্ষ হয়ে পড়লেন শ্যামাপ্রসাদ। বললেন, 'আজ আশুতোষ কলেজে একটা ফাংশানে আমার উপস্থিত থাকার কথা। যাই হোক নজরুল সাহেব থাকেন কোথায়? আপনি কি তাঁর বাড়ি চেনেন?'

—'হ্যাঁ চিনি।'

—'তাহলে আমাকে নিয়ে চলুন। আমি তাঁকে দেখব।' তারপর আর্দালিকে বললেন, 'আমি আজ আর অফিসে ফিরব না। তুমি ওয়াকার সাহেবকে একথা বলে দিও।' এরপর নিজের গাড়িতে হায়দারকে নিয়ে উঠে পড়লেন শ্যামাপ্রসাদ। গাড়ি ছুটল গ্রে

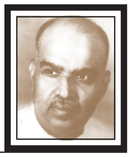

স্ট্রিটের দিকে। সেখান থেকে শ্যামবাজার।

—'আচ্ছা, কবির চিকিৎসার ভাল ব্যবস্থা হচ্ছে না কেন? ওঁর আর্থিক অবস্থা এখন কেমন?'

—'কী আর বলব। অবস্থা শোচনীয়। দেনায় একেবারে ডুবে রয়েছেন কাজী নজরুল।'

'ওঁদের তাহলে চলছে কী করে?'

শ্যামবাজারে পৌঁছে আর এক বিপত্তি। সংকীর্ণ সেকেলে বাড়ি, ততোধিক সংকীর্ণ সিঁড়ি। শ্যামাপ্রসাদ ওই খাড়াই সিঁড়ি বেয়ে উঠবেন। কী করে? গড়পড়তা বাঙালিদের তুলনায় তাঁর চেহারাটি যে কিঞ্চিৎ বড়সড়! হায়দারের অস্বস্তি বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। নিজে থেকেই বললেন, 'কী আর করা যাবে। দেখাই যাক না। আস্তে আস্তে উঠব'খন।' দোতলায় উঠে রীতিমতো হাঁফাতে লাগলেন খানিকক্ষণ। তারপর ঢুকলেন নজরুলের ঘরে। শ্যামাপ্রসাদকে দেখে হাত তুলে নমস্কার করলেন নজরুল। বলতে লাগলেন নিজের কথা, অসুখের কথা, এখন কী করতে চান সেই কথা। জিভ আড়ষ্ট হয়ে আসছে, কথা ভাল বোঝা যায় না, তবু চেতনার জগৎ থেকে তখনও তিনি পুরোপুরি প্রস্থান করেননি। কাজী বলে যাচ্ছেন। সব কথা বুঝতে পারছেন না শ্যামাপ্রসাদ। তবু চেষ্টা করছেন প্রাণপণ--- সে এক স্মরণীয় আলাপচারিতা।

নজরুল বোধহয় অনুভব করছিলেন তাঁর কথা বুঝতে কষ্ট হচ্ছে শ্যামাপ্রসাদের। জড়ানো গলায় কাগজ-কলম চাইলেন। ছেলে সানি— কাজী সব্যসাচী— ছুটে গিয়ে পাশের ঘর থেকে কাগজ-কলম এনে দিল। কাঁপা হাতে লিখে চললেন কবি, তিনি মনে করছেন কমপ্লিট রেস্ট পেলে একেবারে সেরে উঠবেন। কলকাতায় সেই বিশ্রাম হবে না। অনবরত লোকজনের যাতায়াতে মাথা যাবে আরও গরম হয়ে। তিনি মধুপুরে যেতে চান প্রতিবেশী এক ডাক্তারের সঙ্গে।

কথা বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন ডাঃ

নজরুলের চিঠি

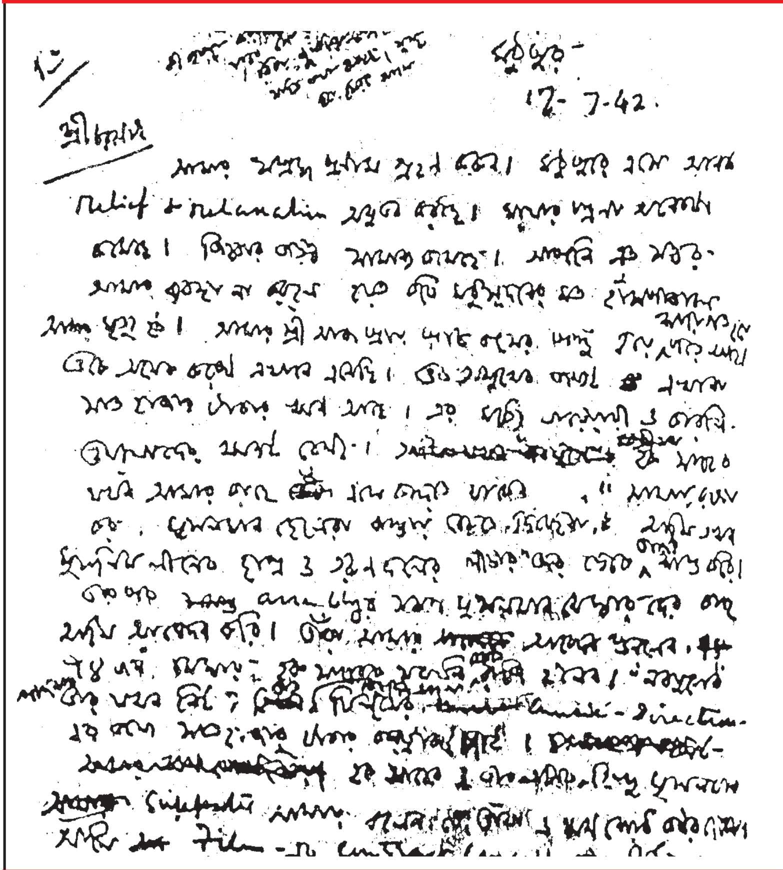
17-7-42.

সরকার। নজরুলের সেই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক। শ্যামাপ্রসাদ অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিলেন চিকিৎসার গতিপ্রকৃতি। নজরুল কাগজে লিখেছেন, মুখেও বললেন, মাস দুয়েকের জন্য মধুপুর যেতে চান। স্ত্রীর নিম্নাঙ্গ পক্ষাঘাতে অসাড়। ট্রেনভাড়া, বাড়িভাড়া, খাইখরচ আর দেখাশোনার জন্য তাই আরও দুজন লোককে নিয়ে যেতে হবে। এজন্য চাই কম করে এক হাজার টাকা।

সেই ১৯৪২ সালে এক হাজার টাকার অনেক দাম। পরাধীন ভারতে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা তখনও এমন উন্নত হয়নি যে যখন তখন ব্যাঙ্কে গেলেই টাকা তোলা যাবে। শ্যামাপ্রসাদ অবস্থাপন্ন মানুষ। ব্যাঙ্কের সুবিধা তিনি পেতেই পারেন। কিন্তু নজরুলের বাড়িতে কথায় কথায় তখন পাঁচটা বেজে গেছে। ছুটি হয়ে গেছে ব্যাঙ্ক। এদিকে নজরুলের চিকিৎসার জন্য ডাঃ সরকারকে পরদিনই মধুপুর যেতে হবে। তাঁর সঙ্গে কবিকে সপরিবার পাঠিয়ে দেওয়াই হবে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। চিন্তিত শ্যামাপ্রসাদ খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে হায়দারকে বললেন, চলুন তো একবার ভবানীপুর। ওখানে আমার পরিচিত কয়েকটা জুয়েলারির দোকান আছে— চলুন তাদের কাছে যাই। মনে হয় খোলা পাব। একবার শ' পাঁচেক হাতে পেলে কাল টাকা শোধ করতে অসুবিধা হবে না।

শ্যামাপ্রসাদের গাড়ি ছুটল ভবানীপুরের পথে। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। কলকাতার

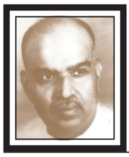

রাজপথে জ্বলে উঠছে সারি সারি গ্যাসবাতি। আঁধার ঘনাচ্ছে দিগন্তে। ভিতরে নিশ্চুপ চিন্তামগ্ন শ্যামাপ্রসাদ আর হায়দার।

টাকা জোগাড় শেষ পর্যন্ত হলো। মধুপুরে রওনা হলেন সপরিবার নজরুল। সারাদিন নজরুলের জন্য কেটে যাওয়ায় সেদিন আশুতোষ কলেজে আর যেতে পারেননি শ্যামাপ্রসাদ। ফাংশানটি ছিল বাবা, স্যার আশুতোষের স্মৃতি উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান। সারা দিনের ছুটোছুটির মধ্যে সে অনুষ্ঠানের কথা একবারও উচ্চারণ করেননি শ্যামাপ্রসাদ। বাবার স্মরণ অনুষ্ঠানে যেতেও পারেননি। বাংলার প্রিয় কবি সঙ্কটে পড়েছেন, সমস্ত জাতির হয়ে তার সুরাহা করতে তিনি ছুটে এলেন। কবির প্রিয়জনেরা বলছেন, নজরুলের সুসময়ে যারা বাড়ি এসে ভিড় জমাত, কাপের পর কাপ চা আর জলখাবারের সদ্‌গতি করত, তাদের কারোর খোঁজ নেই। এই অবস্থায় অভয়হস্ত প্রসারিত করে এগিয়ে এলেন এমন একজন মানুষ যাঁর সঙ্গে নজরুলের সেভাবে কোনও পরিচয়ই ছিল না।

১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে জুলফিকার হায়দারকে লেখা শ্যামাপ্রসাদের একটা চিঠি পাচ্ছি, তিনি লিখছেন : 'আপনি আমাকে যেদিন কবির বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেদিন কবির আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা নিয়ে এসেছি। আপনার সঙ্গে আলোচনা করে উপায় উদ্ভাবনের জন্য উদ্‌গ্রীব রয়েছি। আপনি একদিন আমার এখানে এলে খুশি হব।'

আসলে এককালীন কিছু টাকা দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলতে চাননি শ্যামাপ্রসাদ। সেটা খুব চেনা রাস্তা— সুনামও হয়, চাপও পড়ে না। তিনি চাইছিলেন একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করতে। কিন্তু একাজ একা একা করা যায় না। চাই লোকবল। চাই সমাজের প্রভাবশালী কিছু মানুষের সমর্থন। হায়দারকে যখন চিঠি লিখছেন শ্যামাপ্রসাদ, এই স্থায়ী ব্যবস্থার কথা তখনই তাঁর মাথার মধ্যে ঘুরছিল।

উত্তর কলকাতায় শ্যামবাজারের কাছে মোহনবাগান রো-তে তখন ছিল শনিবারের চিঠির অফিস। নজরুলের কথা ভাবতে ভাবতে একদিন হায়দার হাজির হলেন পত্রিকা সম্পাদক সজনীকান্ত দাসের ঘরে।

—কী ব্যাপার হায়দার? বহুদিন পর। সবকিছু কুশল তো?

—না দাদা, ভাল আর কোথায়? কবি নজরুল ইসলাম জটিল অসুখে পড়েছেন। তাঁর বাড়ির লোক অর্থাভাবে বিপর্যস্ত।

নড়েচড়ে বসলেন সজনীকান্ত।

---তুমি আমাকে সব খুলে বলো হায়দার। কে দেখছেন? কী চিকিৎসা হচ্ছে? নজরুলের এখন কী রকম অবস্থা?

হায়দার সাহেব যতটা জানেন সবকিছু সবিস্তারে বলে চললেন। সজনীকান্তের ঘরে তখন উপস্থিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। খানিক বাদে হাজির হলেন অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষ। সকলে মন দিয়ে শুনলেন। ঠিক হলো পরদিন নজরুলের বাড়িতে সজনীকান্ত আর তারাশঙ্কর যাবেন। তারাশঙ্কর অবশ্য যেতে পারেননি সেদিন। তবে সজনীকান্তের সঙ্গে গিয়েছিলেন সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। নজরুল কাউকেই চিনতে পারলেন বলে মনে হলো না। একবার তাকিয়েই মুখ সরিয়ে নিলেন। নির্বাক, নিশ্চুপ। অন্য কোনও জগতের বাসিন্দা যেন। বেদনাহত অতিথিরা।

কিছু একটা করার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন সজনীকান্ত। পরের রবিবার শ্যামাপ্রসাদের বাড়িতে মিটিং। হায়দারের সঙ্গে সেখানে হাজির হলেন তিনি। ভাইস চ্যান্সেলর শ্যামাপ্রসাদের বৈঠকখানায় তখন বসে আছেন অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ বদরুদ্দোজা এবং আরও জনাকয়েক বিশিষ্ট মানুষ। শ্যামাপ্রসাদ বললেন, কবিকে রোগমুক্ত আর উদ্বেগমুক্ত করতে কিছু জিনিস আমি ভেবেছি। পরদিন আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব।

পরদিন বেলা ন'টা নাগাদ শ্যামাপ্রসাদের বাড়িতে আবার গেলেন দু'জনে। শ্যামাপ্রসাদ মনে মনে একটু গুছিয়ে নিয়ে বলতে শুরু করলেন, 'আমি ভেবে দেখলাম, প্রতি মাসে অন্তত শ' দুই টাকা কবিকে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। আমার নিজের পক্ষে একা এই দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়। তাই ভেবেছি এ মাসে পাইকপাড়ার মহারাজ বিমলাপ্রসাদ সিংহের কাছে কবি নজরুলের জন্য দুশো টাকা চাইব। পরের মাসে মেদিনীপুরের রাজা মল্লদেবের কাছে চেয়ে পাঠাব। এভাবে যে ক'দিন জোগাড় করতে পারি দিতে থাকি। পরে গভর্নমেন্টের থেকে একটা সাহিত্যিক ভাতা দেওয়ার চেষ্টা করা যাবে। শ্যামাপ্রসাদ এইসঙ্গে একথাও স্পষ্ট করে দিলেন— এ বিষয়ে একটা কমিটি দরকার, যেখানে থাকবেন সমাজের বিশিষ্টরা।

সজনীকান্ত আর হায়দার মিলে তখনই একটা প্রাথমিক তালিকা তৈরি করলেন যাতে ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, চপলাকান্ত ভট্টাচার্য, তুষারকান্তি ঘোষ, গোপাল হালদার, কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ। বিমলানন্দ তর্কতীর্থ খোদ রবীন্দ্রনাথের চিকিৎসক ছিলেন। ধন্বন্তরী আয়ুর্বেদাচার্য। কয়েকদিন আগেই তিনি বলেছিলেন, এই প্রতিকূল অবস্থা থেকে কবি নজরুল মুক্তি পান, সেটাই তিনি একান্তভাবে চাইছেন।

দিন দুয়েক পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙা বিল্ডিংয়ে উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মিটিং। যথাসময়ে হাজির তারাশঙ্কর, সত্যেন মজুমদার, চপলাকান্ত, তুষারকান্তি, সজনীকান্ত, সকলে।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সবার দিকে তাকিয়ে আবহাওয়াটা বোধহয় বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন, 'আমাদের একটা ত্রুটি হচ্ছে। কবি নজরুলের জন্য আমরা আজ যারা এখানে উপস্থিত হয়েছি তাদের মধ্যে একজন বাদে বাকি সবাই হিন্দু। আমার মনে হচ্ছে নজরুল সাহায্য কমিটিতে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের নাম থাকা

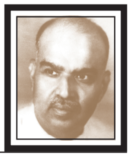

অবশ্য প্রয়োজন, নয়তো কেউ না কেউ এর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ খুঁজে পাবেন। খানিকটা বিতর্কের পর শ্যামাপ্রসাদের যুক্তি সকলে মেনে নিলেন। শ্যামাপ্রসাদ এরপর মিটিংয়ের মধ্যেই কয়েকজন বিশিষ্ট মুসলমানকে টেলিফোন করে তাঁদের সম্মতি আদায় করলেন। শেষ পর্যন্ত যে কমিটি চূড়ান্ত হলো, তার সদস্য সংখ্যা দাঁড়াল ১৩।

১। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ। ২। সজনীকান্ত দাস, যুগ্ম সম্পাদক। ৩। জুলফিকার হায়দার, যুগ্ম সম্পাদক। ৪। সৈয়দ বদরুদ্দোজা, সদস্য, কার্যকরী কমিটি। ৫। স্যার এ এফ রহমান, সদস্য, কার্যকরী কমিটি। ৬। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সদস্য, কার্যকারী কমিটি। ৭। হুমায়ুন কবির, সদস্য, কার্যকরী কমিটি। ৮। বিমলানন্দ তর্কতীর্থ, সদস্য, কার্যকরী কমিটি। ৯। তুষারকান্তি ঘোষ, সদস্য, কার্যকরী কমিটি। ১০। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, সদস্য, কার্যকরী কমিটি। ১১। চপলাকান্ত ভট্টাচার্য, সদস্য, কার্যকরী কমিটি। ১২। গোপাল হালদার, সদস্য, কার্যকরী কমিটি। ১৩। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সদস্য কার্যকরী কমিটি।

কমিটি অর্থ সংগ্রহ করা শুরু করল সাধারণ মানুষের কাছে। তাদের জোগাড় করা মাসিক দুশো টাকায় এরপর কিছুদিন শান্তিতে ছিলেন নজরুল। মুদির দোকান, ঘরভাড়া সবটা মিটত না। কিন্তু দুবেলা ভাতের ব্যবস্থা তো হচ্ছিল। এইভাবে চলল মাস পাঁচেক। তারপর ঘটল অভাবনীয় এক বিপর্যয়।

ষষ্ঠ মাসের টাকা আসতে দেরি হচ্ছে কেন তার খোঁজ নিতে সজনীকান্তের কাছে গিয়েছিলেন হায়দার। প্রশ্ন শুনেই সজনীকান্ত অগ্নিশর্মা।

—'কী বলছ তুমি হায়দার? টাকা! কীসের টাকা? যে ক'মাস দেওয়া হয়েছে সেটাই দেওয়া উচিত হয়নি। ড. মুখার্জিকে বলে দিয়েছি তিনি যেন নজরুলের জন্য আর কারও কাছে হাত না পাতেন।'

—'কেন সজনীদা? কাজীদার কী অপরাধ?'

—'এই তো তোমাদেরই ধর্মের এক নামকরা কবি এসে বলে গেল, নজরুলের বাড়িতে এখনও আগের মতোই মণ্ডা-মিঠাই চলছে। আশ্রিতরা জাঁকিয়ে বসে রাজসিক খানাপিনা চালাচ্ছে। কারোর নড়বার নামটি নেই। এদিকে আমরা লোকের কাছে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছি!'

সজনীকান্তের রাগ যেন কিছুতেই যাচ্ছে না। বললেন, 'নজরুলকে সাহায্য করার ব্যাপারে আমার আর কিছুমাত্র আগ্রহ নেই। তুমি যদি মনে করো ড. মুখার্জিকে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারো।'

কিন্তু কে সেই কবি? চেতনাহীন নজরুলের এতবড় সর্বনাশ যিনি করে এলেন! নাছোড়বান্দা জুলফিকার পীড়াপীড়ি করে শেষ পর্যন্ত সজনীকান্তের মুখ থেকে নামটা সেদিন জেনে নেন। রাগে ঘেন্নায় সর্বাঙ্গ রি-রি করে ওঠে তাঁর। কিন্তু কিছু করার নেই। ক্ষতি যা হবার তা হয়ে গিয়েছে।

পরবর্তীকালে প্রশ্ন তুলেছিলেন মুজফ্‌ফর আহমেদ— ওই কবির চেয়ে নজরুল আর তাঁর পরিবারকে অনেক ভাল চিনতেন সজনীকান্ত। তাহলে তিনি তখন কাজীর বাড়িতে গেলেন না কেন? কেন পরের মুখের ঝাল খেয়ে 'বুঝে' গেলেন, নজরুলের বাড়িতে মোচ্ছব চলছে। এমনকী শ্যামাপ্রসাদকেও প্রভাবিত করলেন।

আগের মতো সাদর সম্ভাষণ জুটল না। শ্যামাপ্রসাদের সেক্রেটারির কাছেও। অর্থাৎ রটনাটা তাঁর কানেও গেছে। হায়দারকে দেখে বসতেও বললেন না সেক্রেটারি চিত্তবাবু। পরে খানিকটা নরম হয়ে উগরে দিলেন সেই একই মুসলমান কবির নাম। যিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে দায়িত্ব নিয়ে এই 'উপকার' করে এসেছেন। কোনওমতে রাগ চেপে এরপর হায়দার ঢুকলেন শ্যামাপ্রসাদের ঘরে। ড. মুখার্জির মুখেও আগের সেই উষ্ণতা নেই। সৌজন্য বিনিময়ের পর নজরুলের মাসোহারার কথাটা পাড়তেই শ্যামাপ্রসাদ রাখঢাক না করে হায়দারকে বলে দিলেন, 'মাফ করবেন, আর টাকা দেওয়া যাবে না। ওই বাড়িতে যা চলছে, আগে জানতে পারলে এটুকুও আমি করতাম না।'

লজ্জায় দুঃখে শ্যামাপ্রসাদের বাড়ি থেকে সেদিন বেরিয়ে এসেছিলেন হায়দার সাহেব। চলে আসার আগে শুধু বলে আসেন, 'কারও মুখের কথা একতরফা ভাবে বিশ্বাস করে নেওয়া বোধহয় ঠিক হলো না ড. মুখার্জি।'

শ্যামাপ্রসাদের চিন্তা সেদিন কিন্তু ওখানেই থেমে যায়নি। গোটা বিষয়টা অন্যভাবে ভাবতে শুরু করেছিলেন তিনি। তবে কি কোথাও ভুল হলো? নজরুলের বাড়িতে মোচ্ছব চলছে বলে যে কথা রটিয়ে গেলেন তাঁরই স্বজাতীয় কবি— সেটা কি ঠিক? নাকি গাত্রজ্বালা! রটনা করে অন্যের সর্বনাশের চেষ্টা? সাহায্য কমিটির তৎপরতা বন্ধ হয়ে গেল ঠিকই, কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ বিষয়টা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেললেন না। কিছুদিন পর বাংলা গভর্নমেন্ট অসুস্থ, দুঃস্থ বিদ্রোহী কবির জন্য স্থায়ী সাহিত্যিক ভাতার ব্যবস্থা করে। এর পিছনে ছিল অর্থমন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদেরই প্রশাসনিক তৎপরতা। ফজলুল হকের সঙ্গে আলোচনা করে মাসে দুশো টাকা করে সরকারি সাহায্য পাঠানোর বন্দোবস্ত করেন শ্যামাপ্রসাদ রোগে, শোকে, দারিদ্র্যে বিপর্যস্ত কবি পরিবারের একটু সাশ্রয়ের জন্য। এরপর ভারত যখন স্বাধীন হলো নির্বাচিত পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেই সাহায্যের পরিমাণ বাড়িয়ে করে দেয় তিনশো টাকা প্রতি মাসে।

যে মানুষটির সঙ্গে আগে কখনও পরিচয় হয়নি শ্যামাপ্রসাদের, যাঁর অসমান্য কাব্যপ্রতিভার তিনি স্বাদ পেয়েছিলেন দূর থেকে, বিপর্যয়ের সময়ে সেই নজরুলের পাশেই যেন জন্মজন্মান্তরের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। যেন প্রমাণ করে গেলেন মুখে-মুখে ফেরা নজরুলের সেই কবিতাটি— 'মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম, হিন্দু-মুসলমান।'

(লেখক প্রবীণ সাংবাদিক)

তাহাতে নাম লিখিও 'ড. শ্যামাপ্রসাদ'

ড. জিষ্ণু বসু

খুব বেশি হলে ১২ ফুট চওড়া রাস্তা। রাস্তা ধরে একশো মিটারের মতো গেলে পোলিং বুথ। রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের জিপটাতে মোট ১২ জন মানুষ। ৫ জনের পোলিং পার্টি। তারা সবাই কাশ্মীরি। কাশ্মীর পুলিশের জনা দুয়েক কনস্টেবল। তারাও স্থানীয়। সেই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় রাইফেলস বাহিনীর মেজর লিতুল গগৈকে নিয়ে মোট ৫ জন সেনা। অপরিসর রাস্তার দুপাশের উঁচু বাড়ি থেকে অবিরত বর্ষণ করা হচ্ছে পাথর সঙ্গে দু'একটা মলোটভ ককটেল, মানে পেট্রল বম্ব। হয়তো অনেক কিছুই করা যেত, তবে লিতুল গগৈ হিউম্যান শিল্ডের আশ্রয় নিলেন। ফারুক আহমেদ নামের এক বিক্ষোভকারীকে ধরে জিপের সামনে বেঁধে দিলেন। বন্ধ হলো পাথর ছোঁড়া। পোলিং পার্টি বুথে পৌঁছোল। সেই ভিডিও প্রকাশিত হওয়ার পর বিতর্কের ঝড় উঠল। খুব অমানবিক ব্যাপার। দুই বঙ্গসন্তান ঝাঁপিয়ে পড়লেন। প্রথমজন প্রণয় রায়। এনডি টিভির সুপ্রিমো। এনডি টিভির মালকিন রাধিকা রায় সিপিএম নেত্রী বৃন্দা কারাতের বোন। ১৯৯৮ সালে ইন্দ্রকুমার গুজরাল সরকার দূরদর্শনে আধুনিকীকরণের টাকা তছরূপের অভিযোগে সিবিআই তদন্ত শুরু করেছিল। পেশাধারী সাংবাদিকের দেশাত্মবোধ থাকাই উচিত নয়— এটাই এনডি টিভির মূলমন্ত্র। প্রণয় রায় বললেন, কাশ্মীরের আন্দোলন একান্ত যুক্তিসঙ্গত। আর এক বঙ্গসন্তান পার্থ চট্টোপাধ্যায়। গড়িয়ার পাটুলির কাছে একটি সংস্থা সেন্টার অব স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস। এটি কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি দপ্তরের সাহায্যপ্রাপ্ত গবেষণা সংস্থা। পার্থবাবু সেখানকার সমাজ বিজ্ঞানের অধ্যাপক। পার্থবাবু সেনাপ্রধান বিপিন রাওয়াতকে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের নায়ক জেনারেল ডায়ারের সঙ্গে তুলনা করলেন। কেন? না, মেজর লিতুলকে পরোক্ষ সমর্থন করে ভারতীয় সেনাধ্যক্ষ সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের মতোই কাজ করেছেন। তাই জালিয়ানওয়ালাবাগে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ভারতীয়দের উপর যেমন নির্মম অত্যাচার করেছিল আজ ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদী সেনাও কাশ্মীরিদের একইভাবে অত্যাচার করছে।

আজ থেকে ৫/৭ বছর আগে হলেও সবাই এই দুই বঙ্গবীরকে ধন্য ধন্য করত। কিন্তু আজ পশ্চিমবঙ্গের গুটিকয় দীক্ষিত সংবাদমাধ্যম বাদ দিলে, ভারতবর্ষ জুড়ে এদের নিন্দা হয়েছে। মূল ধারার প্রচারমাধ্যম, সেইসঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়াতে এসেছে সরাসরি চ্যালেঞ্জ। ১৯৮০-র দশক পর্যন্ত কাশ্মীরে পণ্ডিতদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৮ লক্ষ (এ জি নুরানি, ২০১৬, ডন) আর আজ সংখ্যা দুই থেকে আড়াই হাজার। এই মানুষগুলো কোথায় চলে গেলেন? মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়নি তো? এন ডি টিভি তা নিয়ে তথ্যচিত্র বানাক না! কাশ্মীরে হরকত উল-জেহাদ-মুজাহিদিন, জৈস-ই-মহম্মদ বা লস্কর-ই- তৈবার টাকা ও প্রশিক্ষণ দেয় আই এস আই। আর তাদের পেছনে আছে মহামতি চীন ও আই এস। এটা বুঝতে বিলেত ফেরত হতে হয় না, প্রয়োজন একটু নিঃস্বার্থ বাস্তববুদ্ধির। সোশ্যাল মিডিয়াতে আজকের যুব প্রজন্ম প্রশ্ন করছে, বিলেত থেকে যাদের ফেরত পাঠিয়েছে তারা 'ভারতবর্ষের বরবাদি' চান, ভাল কথা কিন্তু তারা ভারতবর্ষের বুকে বসে ভারতের গলার নলি কাটবেন সেটা চলবে না। যে ওয়েব পত্রিকায় ওই জালিয়ানওয়ালাবাগের সঙ্গে তুলনা করে লেখাটা বের হয়েছে তার নাম 'দ্য ওয়ার'। 'দ্য ওয়ারে'র পাবলিক এডিটর পামেলা ফিলিপোস। পামেলা কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ সহযোগিতায় চালিত 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ'-এর অধ্যাপিকা। ওই সংস্থার টাকা তো দেশবাসীর করের টাকায়। দিল্লির উদ্বাস্তু কলোনিতে থাকা কাশ্মীরি পণ্ডিত বাড়ির হতদরিদ্র যুবকটিও ওই কর দিয়েছে। আজ সর্বত্র প্রশ্ন উঠছে, দেশের বরবাদির জন্য যাঁরা ওকালতি করছেন তাদের পালন পোষণের ভার কেন নেবে দেশবাসী? দেশাত্মবোধের কথা ছেড়েই দিন, কয়েক প্রজন্মের সাধনার ফলে কোনো পরিবারে একজন দেশভক্ত জন্মায়। ন্যূনতম বিবেকবোধ থাকলেও কি কোনো শিক্ষিত মানুষ এমন কাজ করতে পারে? আজ

বিলেত ফেরত 'ভারতের বরবাদি'ওয়ালারা বুঝে গেছেন সাধারণ মানুষ আর তাঁদের ওয়াকওভার দেবেন না।

ঠিক তখনই সারা দেশের সংবাদমাধ্যমে, ফেসবুকে, ট্যুইটরে বারবার আসছে একজনের নাম। তিনিও এক বাঙালি মনীষী। কাশ্মীরের আজকের সমস্যার কথা বুঝতে পেরে যিনি প্রতিকার করতে গিয়েছিলেন। সারা দেশে 'এক বিধান, এক প্রধান আর এক নিশান' না হলে ভবিষ্যতে কী ভয়ানক বিপদ হবে সেদিন দুজন মানুষ বুঝেছিলেন। একজন বাবাসাহেব আম্বেদকর আর দ্বিতীয় জন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ৩৭০ ধারার কথা বলতে যাওয়ায় শেখ আবদুল্লাকে ড. আম্বেদকর ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। পণ্ডিত নেহরু যখন নায়ারকে দিয়ে সেই ধারা পিছনের দরজা দিয়ে পাশ করালেন, তখন গর্জে উঠেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। যখন কাশ্মীরের সীমান্তে শ্যামাপ্রসাদকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল তখন সহযোগী তরুণ সাংবাদিক অটলবিহারী বাজপেয়ীকে ফিরে যেতে বললেন। শ্যামাপ্রসাদের শেষ কথা ছিল— 'বাজপেয়ী তুমি ফিরে যাও, আর দেশবাসীকে বলো, আমি কাশ্মীরে ঢুকেছি; কিন্তু পারমিট করিনি!'

আসলে আজ শ্যামাপ্রসাদই জিতে গেছেন। উপত্যকায় পাথর ছোঁড়ার নেপথ্যে যে কারণ তা জানলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে ভারতবিরোধীদের লড়াই প্রায় শেষ। বহুদিন পরে কাশ্মীরে জেহাদি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের উপর ভারতীয় বাহিনীর কবজা এসেছে। মূলত সদিচ্ছা ও সংখ্যাধিক্য (পরিভাষায় নিউম্যারিকাল সুপিরিয়রিটির) জন্য ইম্প্রোভাইস এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস জাতীয় বড় বড় নাশকতার উপাদান বহুদিন ব্যবহার হচ্ছে না। প্রতিদিন সকালে 'ডি এস এমডি' বা অন্যান্য অত্যাধুনিক যন্ত্র দিয়ে শ্রীনগরের প্রায় প্রতি ইঞ্চি রাস্তা পরীক্ষা করা হয় কাকভোরে। অতি কার্যকর জ্যামার ব্যবস্থার জন্য রেডিও অপারেটেড বা রিমোট কন্ট্রোল এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস ব্যবহারও প্রায় বন্ধ। ৭/৮ বছর আগে আফগানিস্তানের তালিবানদের কাছ থেকে বিস্ফোরক ব্যবহারের প্রযুক্তি কাশ্মীরি জেহাদিদের মাধ্যমে অতিবামপন্থী মাওবাদীরা ভারতে আমদানি করেছে। কিন্তু বিভিন্ন রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনীর তৎপরতার জন্য এই ব্যবস্থাও প্রায় বন্ধ। অথচ প্রতিমাসে আইএসআই টাকা দিচ্ছে। অত্যাধুনিক ফিউম ডিটেক্টর ব্যবহারের জন্য উপত্যকাতে আর ডি এক্স আমদানিও প্রায় বন্ধ। জঙ্গিরা জেনে গেছে বাহিনীর হাতের ওই ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের মতো যন্ত্রটি পোশাকের ভেতরে রাখা ৫০ গ্রাম বিস্ফোরকও ধরে ফেলবে। তাই পুরুষ মহিলা সকলকে দিয়ে জোর করে টাকার লোভ দেখিয়ে পাথর ছোঁড়ানো। সৈন্যবাহিনী কাশ্মীরি যুবক-যুবতীদের জন্য সুপার-৪০ নামে এক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। আইএএস, আইপিএস ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তির পরীক্ষার জন্য। এবছর সেখান থেকে ৯ জন ছাত্রছাত্রী জয়েন্ট এন্ট্রান্সে সফল হয়েছে। তাই উপত্যকায় ছোঁড়া প্রতিটি পাথর আর মলোটভ ককটেলে আছে হিজবুল মুজাহিদিন, লস্কর-ই-তৈবা এবং জৈস-ই-মহম্মদের দীর্ঘশ্বাস।

পশ্চিমবঙ্গে এবছর রামনবমীর সময় লক্ষ লক্ষ হিন্দু সমবেত হয়ে পথে নেমেছেন। প্রশাসন অভিযোগ করেছে যে অস্ত্র নিয়ে পথে নেমেছে মানুষ। দীক্ষিত সংবাদমাধ্যম হা-হুতাশ করছে। এ কখনোই বাংলার সংস্কৃতি নয়! কিন্তু মানুষ আজ আর চুপ করে শুনছে না। পাল্টা প্রশ্ন করছে সেইসব প্রগতিবাদী সাংবাদিকদের। তবে কোনটা বাংলার সংস্কৃতি? দেগঙ্গার দাঙ্গা? ক্যানিং নলিয়াখালির নৃশংস আক্রমণ? ২০১৭ সালে কলকাতায় বসে মধ্যযুগের ফতোয়া জারি করা কী বঙ্গসংস্কৃতি? জুড়ানপুরে তিনজন তরতাজা দলিত যুবককে দিনের আলোকে খুন করা? খাগড়াগড়ের বিস্ফোরণ? সিমুলিয়া মাদ্রাসা? নাকি কালিয়াচক, ধুলাগড় এই সবই বাংলার সংস্কৃতি? সত্যি, শিক্ষিত মানুষ এত মেরুদণ্ডহীন হতে পারে? পুলিশ প্রায় বিনা বিচারে প্রায় একশো যুবককে গ্রেপ্তার করেছিল। অভিযোগ তারা সশস্ত্র রামভক্ত। সিউড়ীতে একটি ২৫/২৬ বছরের যুবক টিউশন করে বাড়ি ফেরার পথে গ্রেপ্তার হয়েছিল। তার একমাত্র অপরাধ তার বাইকে গৈরিক পতাকা ছিল। মিথ্যা মামলায় ১৬ দিন হাজতবাসের পরে ছেলেটি বুক চিতিয়ে বলছে, 'ওরা যত বেশি অত্যাচার করবে, আমরা ওদের তত বেশি করে ঘৃণা করব। এই সহজ কথাটা ওই অত্যাচারীরা বোঝে না!' তারপর বুক পকেট থেকে একটি ভাজ করা ছবি বের করল। শ্যামাপ্রসাদের ফটোর নীচে লেখা, 'অন্যায়ের প্রতিবাদ করো, প্রতিরোধ করো, প্রয়োজনে প্রতিশোধ নাও।"

১৯৪২ সালের ৭ জুলাই কাজী নজরুল ইসলাম ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে

লিখেছিলেন— ‘আমি জানি, আমরাই এই ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বাধীন করব— সেদিন আপনাকে ও সুভাষ বসুকেই সকলের আগে মনে পড়বে। আপনারাই হবেন এদেশের সত্যকার নায়ক’। প্রকৃত অর্থেই স্বাধীন ভারতের কাণ্ডারি হয়ে উঠেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। প্রথম লোকসভা নির্বাচনে একক বিরোধী দল হিসাবে সবচেয়ে বেশি আসন ছিল সিপিআই দলের। তা সত্ত্বেও ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্বাধীন ভারতের প্রথম সংসদে সর্বসম্মতভাবে বিরোধী দলনেতা হিসেবে নির্বাচিত হন। সেদিন বাংলার মানুষের হৃদয় সম্রাট ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ, সেটা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষযাত্রার দিন জনসমুদ্রের নেতৃত্ব দানেই হোক আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ভারতের প্রথম পরমাণু গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনে ড. মেঘনাদ সাহার একান্ত পৃষ্ঠপোষক হিসেবেই হোন— সর্বত্র শ্যামাপ্রসাদ। আজকের ভারত বিখ্যাত গবেষণাকেন্দ্র সাহা ইন্সটিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের ভিত্তিপ্রস্তরটা তাঁর হাতেই স্থাপিত হয়েছিল। তেমনই দিল্লির মন্দিরমার্গ ধরে গেলে কালীবাড়ি থেকে শুরু করে বাঙালি অস্তিত্বের সবকটি সংগঠনের প্রতিটি বাড়ির ফলকে লেখা শ্যামাপ্রসাদের নাম। নজরুলের ভবিষ্যদ্‌বাণী সত্যি হয়েছিল সেদিন।

কিন্তু কাশ্মীরে শ্যামাপ্রসাদকে হত্যা করার পরই শ্যামাপ্রসাদকে ভুলিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত শুরু হয়। সুভাষ আর শ্যামাপ্রসাদ জনমানস থেকে এই দুই দেশপ্রেমিক মানুষের স্মৃতি মুছে দেওয়া প্রয়োজন ছিল সে যুগের দুই রাজনৈতিক শক্তির। ১৯৫৩ সালের ২৩ জুন শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুসংবাদ এল। কোনো এক অজ্ঞাত কারণে তাঁর মরদেহ মাঝরাতে বিমানে করে কলকাতায় আনা হলো। কিন্তু তখনও সেখানে কাতারে কাতারে মানুষ। শ্যামাপ্রসাদের বাড়ির সামনে ট্রামলাইনে শুয়ে সারারাত কাটিয়েছেন সেদিন হাজারে হাজারে মানুষ। এই জনপ্রিয়তা দেখে কংগ্রেস প্রমাদ গুনল। এই বিপুল জনশক্তি কাশ্মীরে নেহরু আর শেখ আব্দুল্লার কৃতকর্মের জবাব চাইবে যে! সেদিন কংগ্রেসকে বাঁচাতে এগিয়ে এসেছিল বামদলগুলি। এক হীন মাস্টারস্ট্রোক। তখন কলকাতায় ট্রাম চালাত ক্যালকাটা ট্রাম কোম্পানি নামে এক ব্রিটিশ কোম্পানি। তারা ট্রামের ভাড়া ১ পয়সা বাড়িয়েছিল। সে নিয়ে আলোচনাও চলছিল। কিন্তু হঠাৎ শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর ৭ দিন পর থেকে জঙ্গি আন্দোলন শুরু করল বামেরা। ১ জুলাই ১৯৫৩ সালে কলকাতায় ১১টি ট্রাম পোড়ানো হলো। ময়দানের সামনে মিটিং করার পর গ্রেপ্তার করা হলো জ্যোতি বসু, সুবোধ ব্যানার্জী, সুরেশ ব্যানার্জী, সত্যপ্রিয় ব্যানার্জীদের। এর প্রতিবাদে বামেরা ৪ জুলাই রাজ্যে সাধারণ ধর্মঘট ডাকল। শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর তখনও ১৫ দিনও কাটেনি।

আজ কিন্তু কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী সর্বত্র ড. শ্যামাপ্রসাদের ছবি। পাহাড়ে, বনে, গ্রামে, ঝলমলে শহরে আলোচিত হচ্ছে শ্যামাপ্রসাদের নাম, তাঁর রাজনৈতিক ভাবনা। শ্রীগুরুজী গোলওয়ালকার এবং ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে সামাজিক-রাজনৈতিক ভাবনার বীজ বপন করেছিলেন স্বাধীন ভারতবর্ষে তা মনোহর পুষ্পপল্লবে বিকশিত হয়েছে। কাশ্মীরে আজ আর জঙ্গিদের মানুষ মারার উল্লাস শোনা যাচ্ছে না, শোনা যাচ্ছে তাদের হতাশ দীর্ঘশ্বাস। দিল্লিতে কলকাতায় তাদের তাত্ত্বিক পৃষ্ঠপোষকরা হতাশায় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। সেনাপ্রধানকে জেনারেল ডায়ারের সঙ্গে তুলনা করছেন! বাংলার দীক্ষিত সংবাদমাধ্যম আর নদীয়া জুড়ানপুরের হত্যা কিংবা ঢাকার পূর্ণিমা শীলের পাশবিক অত্যাচারের ঘটনা চেপে রেখে বিকৃত আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারছে না। বরং প্রথম পাতায় খবর করতে হচ্ছে, বাংলার হিন্দুরা কেন সংগঠিত হবে? বাংলার মানুষ বুঝিয়ে দিয়েছে যে একতরফা জেহাদি অত্যাচার, কায়েমি স্বার্থের রাজনীতি তারা মুখ বুঝে সহ্য করবে না। স্বাধীনতার এত বছর পরে যেন সাম্রাজ্যবাদী খোলস ছিঁড়ে বেরিয়ে আসছে সত্যিকারের শাশ্বত ভারতবর্ষ। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কথাটা কবি মধুসূদন দত্ত সম্পর্কে বলেছিলেন। সেদিন বাংলা সাহিত্যে নবজীবনের জোয়ারের ভগীরথ মধুসূদনের নাম লিখতে বলেছিলেন বঙ্গসাহিত্যতরীর পালে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাতেই যেন আজ বলতে ইচ্ছে করছে, ‘‘আজ সুপবন বহিতেছে দেখিয়া ভারতমাতার বিজয় পতাকা উড়াইয়া দিও, তাহাতে নাম লিখিও ‘ড. শ্যামাপ্রসাদ’।’’ ▌

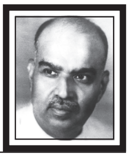

শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুরহস্যের উদ্ঘাটন খুবই জরুরি

অর্ণব কুমার ব্যানার্জী

'এক দেশ মেঁ দো বিধান, দো প্রধান, আউর দো নিশান নহি চলেগা'

এই লেখা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মৃত্যু নিয়ে যে সমস্ত তত্ত্ব প্রচলিত আছে সেইগুলিকে যাচাই করে সত্যে উপনীত হবার জন্য। শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু ভারতীয় রাজনীতির ও সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি। সেই ক্ষতির কারণ আমাদের বুঝতে হবে ঠিকমতো। নতুবা আবার ওইরকম একটা ক্ষতির মুখোমুখি হতে হবে। প্রথমে আমরা দেখব যে শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুতে লাভবান হবে কে এবং কী তার লাভ। পরে সেই সূত্র ধরে আমরা খুঁজে বের করব যে আর কী প্রয়োজন।

বেশিরভাগ সময়েই খুনের কারণ শিকারের কাছেই পাওয়া যায়। খুনের গুরুত্বপূর্ণ সূত্র (ভাইটাল ক্লু) নিহতের কাছেই মেলে। তাই আমরা ভিকটিম বা শ্যামাপ্রসাদকে দিয়ে শুরু করব। এখানে শুধু আমরা আমাদের খোঁজ শ্যামাপ্রসাদের রাজনৈতিক পরিচয়ের মধ্যেই সীমিত রাখব।

শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন নেহরু মন্ত্রীসভার শিল্পমন্ত্রী। পরে তিনি নেহরুর সঙ্গে মতবিরোধ হবার কারণে ইস্তফা দিয়েছিলেন ও ভারতীয় জনসঙ্ঘ গড়েছিলেন যা বিজেপির পূর্বসূরি। ভাবতেও গর্ব হয় যে একজন বাঙালির হাতে হিন্দু জাতীয়তার রাজনৈতিক সঙ্ঘ তৈরি হয়েছে। শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু হয়েছিল কাশ্মীরে। কেন তিনি কাশ্মীরে গিয়েছিলেন?

সংবিধানের ৩৭০ ধারার বিরোধিতা করতে? এইটাই তাঁর মৃত্যুর কারণ? এই ধারার বিরোধিতা করতে গিয়েই মৃত্যু হয়েছিল তাঁর?

ধারা ৩৭০

রাজা হরি সিংহ যখন ভারতে কাশ্মীরকে যুক্ত করেছিলেন তখন তিনি একটা 'ইনস্ট্রুমেন্ট অব এক্সেশান' তৈরি করেন যাতে বলা থাকে যে ভারত কাশ্মীরের প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বিষয়সমূহ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা দেখাশোনা করবে। আর বাকি ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসন বজায় থাকবে। এটাই ছিল শর্ত। কাশ্মীরের মন্ত্রীসভা দাবি করে যে ভারতীয় সংবিধানের সেইসব ধারা কাশ্মীরে প্রযোজ্য হবে যেগুলি ইনস্ট্রুমেন্ট অব এক্সেসানের শর্তগুলিকে সমর্থন করে। এই দাবি মানতে গিয়ে ৩৭০ ধারা চালু করা হয় আর এ বিষয়ে কাশ্মীরের মন্ত্রীসভাকে সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব দেওয়া হয়। যদিও ৩৭০ ধারা সাময়িক ছিল কিন্তু কাশ্মীরের মন্ত্রীসভা নষ্ট হয়ে যাবার পর ওটা চিরস্থায়ী হয়ে যায়। এই ৩৭০ ধারা অনুযায়ী ভারতীয় হিন্দুদের কাশ্মীরে বসবাসের ব্যাপারে কাশ্মীরের মন্ত্রীসভার অনুমতি লাগত। কাশ্মীরের নিজস্ব প্রধানমন্ত্রী (শেখ আবদুল্লা), নিজস্ব পতাকা ও নিজস্ব সংবিধান ছিল। যেহেতু প্রধানমন্ত্রী একজন মুসলমান, সেহেতু ধরে নিতে পারি মন্ত্রীসভার অধিকাংশ সদস্য মুসলমান হবে। শ্যামাপ্রসাদ এর বিরোধিতা করে বলেন এক দেশে দুই বিধান, দুই নিশান আর দুই প্রধান থাকবে না। খুবই সঙ্গত কথা। কথায় আছে এক বনে দুই সিংহ থাকে না বা এক খাপে দুই তরোয়াল থাকে না। সুতরাং এক দেশে দুই আইন থাকবে না। শ্যামাপ্রসাদের এই বিরোধিতাই মনে হয় তাঁর মৃত্যুর কারণ হলো।

কলকাতায় শ্যামাপ্রসাদের অন্তিম যাত্রা।

৩৭০ ধারা উঠে গেলে কার লাভ আর কার ক্ষতি?

যেহেতু ৩৭০ ধারাটা করাই হয়েছে কাশ্মীরের মন্ত্রীসভার দাবিতে সেহেতু এটা অনুমান করাই যায় যে এতে কাশ্মীরের মন্ত্রীসভার স্বার্থ জড়িয়ে আছে। বা আরও বড় করে বললে কাশ্মীরি মুসলমানদের স্বার্থ জড়িয়ে আছে। কারণ কাশ্মীরের হিন্দু সংগঠন জম্মু প্রজা পরিষদ এর তীব্র বিরোধিতা করেছিল। তাদের সঙ্গে যোগ দিতে শ্যামাপ্রসাদ গিয়েছিলেন। সুতরাং ৩৭০ ধারা বাতিল হলে কাশ্মীরি মুসলমানদের বিরাট ক্ষতি। তাদের ক্ষমতা কমে যাবে। তাই সুপরিকল্পিত ভাবে শ্যামাপ্রসাদকে হত্যা করা হলো। হিন্দু ভারতের শাসন যদি কাশ্মীরের উপরে আসে, তাহলে কাশ্মীরি মুসলমানদের ক্ষমতা কমে যাবে। কাশ্মীর থেকে হিন্দুদের বিতাড়ন করা সম্ভব হবে না। নেহরুর সঙ্গে ৩৭০ ধারার কোনো স্বার্থ জড়িত ছিল না। কাজেই ৩৭০ ধারা বাতিল হলে নেহরুর কোনো ক্ষতি নেই আবার লাগু হলে নেহরুর কোনো লাভও নেই।

৩৭০ ধারা চালু থাকলে ভারতের তথা হিন্দুদের বিরাট ক্ষতি। অন্য রাজ্যের লোকেদের কাশ্মীরে বসবাসের জন্য অনুমতি লাগবে। তাদের উপর কাশ্মীরি মুসলমানরা অত্যাচার চালাবে। কাশ্মীরের উপরে কোনো

With Best Compliments From :-

RTS POWER CORPORATION LIMITED

Manufacturers of

E- H - V - GRADE TRANSFORMERS

Power & Distribution Transformers

From 25 KVA to 40 MVA, 132 KV Class

Single Phase Transformers 5 KVA to 25 KVA

Dry Type & Special Type Transformers

Head Office

56, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700 001
Phones : 2242-6025 / 6054
Fax No, : (033) 2242-6732
E-mail : rtspower@vsnl.net

Howrah Works:

130, Dharamtolla Road
Salkia, Howrah - 711 107
Phone No. : 2655-5376 / 3093-6492

Jaipur Works :

C-174, Vishwakarma Industrial Area,
Chomu Road, Jaipur - 302 013
Phone No. : 2330-405 / 2330-269
Fax No. : 0141 2330315
email : rtspower@sancharnet.in

Agra Works :

Mathura Road, P.O. Artoni, Agra - 282 007
Phone No. : (0562) 2641-431

Jaya Shree

THE NAME THAT IS INTERWOVEN WITH TEXTILES THE WORLD OVER

PURE LINEN AND
LINEN BLENDED FABRICS
HIGH PERFORMANCE
FLAME RETARDANT FABRICS
WORSTED YARNS
LINEN YARNS

JAYA SHREE TEXTILES

A UNIT OF ADITYA BIRLA NUVO LTD.

Rishra, P. O. Prabasnagar–712249, Dist. Hooghly, West Bengal, India.

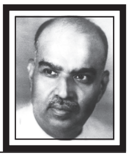

নিয়ন্ত্রণ ভারতের থাকবে না। এছাড়া শিক্ষা-স্বাস্থ্য- ব্যবসাবাণিজ্য-অর্থনীতি কোনো দিকেই ভারতের অধিকার থাকবে না। কাশ্মীরি মুসলমানদের হাত ধরে আসবে পাকিস্তানিরা। তারা আসছে আজও। পাকিস্তানের দোস্ত চীনও এবার নাক গলাচ্ছে। সুতরাং ভারতের তথা হিন্দুদের বিরাট ক্ষতি।

তাহলে শ্যামাপ্রসাদের হত্যাকারী কে?

সন্দেহটা কাশ্মীরি মন্ত্রীসভার দিকে তথা শেখ আবদুল্লার দিকে। কারণ তিনি প্রধানমন্ত্রী। ৩৭০ ধারার তিনিই হলেন উদ্যোক্তা। তারই ক্ষতি যদি এই ধারা না চালু হতো। কাশ্মীরি মুসলমানদের দিকেও সন্দেহের তির আছে। এই বিষয়ে অনুসন্ধান করলে আরও খবর পাওয়া যাবে। শেখ আবদুল্লার ব্যক্তিগত পত্র আর চিঠিপত্র যা পাওয়া যায় সেগুলো দিয়েই খোঁজা যেতে পারে।

মন্ত্রীসভার হিন্দু বিদ্বেষের প্রমাণ :

মন্ত্রীসভা তৈরির প্রস্তাব শেখ আব্দুল্লার দল ন্যাশনাল কনফারেন্সের। তাদের যুক্তি হলো রাজ্যের মানুষ ঠিক করবে রাজ্য কী করে চলবে। তাই মন্ত্রীসভার প্রয়োজন। প্রথমে তারা সংবিধান তৈরি করার কথা বলেছিল। পরে তারা বলে যে সংবিধান নয় ওই মন্ত্রীসভার কথাই শেষ কথা হবে। শুধু তাই নয়, আব্দুল্লার মন্ত্রীসভা এক্সেসানের ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নেবে ঠিক করে। জম্মু-কাশ্মীরের হিন্দুরা এর প্রবল বিরোধিতা করে। জম্মু প্রজা পরিষদ আর হিন্দু সহায়ক সভা বলে যে এটা তো এক্সেসানের বিরোধী আর রাজ্যের স্বাধীনতার পথে পদক্ষেপ। মন্ত্রীসভা বলে আসছে যে কাশ্মীরের ব্যাপারে রাজ্যের মানুষ সিদ্ধান্ত নেবে। এই মানুষ কে? হিন্দু না মুসলমান? মনে হয় এখন বোঝা যাচ্ছে যে এরা কাশ্মীরি মুসলমান। এর পরে জম্মু-কাশ্মীরের রাজা করণ সিংহ আদেশ দেন মন্ত্রীসভা গঠনের (আরেকটা মূর্খতা)। তিনি রাজ্যকে নির্বাচনী বিভাগে ভাগ করার জন্য ডিলিমিটেশন কমিটি গঠন করেন যাতে একজনও হিন্দু ছিল না।

এই ডিলিমিটেশন কমিটি কাশ্মীর আর জম্মুকে নির্বাচনী এলাকায় ভাগ করলেও অধিকৃত কাশ্মীর থেকে আসা উদ্বাস্তু আর শিখদের প্রতিনিধিত্ব খারিজ করে। সুতরাং উদ্বাস্তু এবং শিখ সম্প্রদায়ের কোনো প্রতিনিধি ওই মন্ত্রীসভায় যাবে না। এই উদ্বাস্তু হিন্দু মুসলমান দুইই হতে পারে। তবে শতকরা পঁচিশজন প্রতিনিধি অধিকৃত কাশ্মীর থেকে মন্ত্রীসভায় আসবে। নির্বাচনী আধিকারিক কারা? সবাই ন্যাশনাল কনফারেন্সের মনোনীত। নির্বাচনী বিবাদের নিষ্পত্তি কে করবে? কোনো স্বাধীন কোর্ট নয়, করবে মন্ত্রীসভা। নির্বাচনের শুরু থেকেই বিরোধী পার্টিরা ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর (শেখ আবদুল্লার দল বা কাশ্মীরি মুসলমানদের দল) বিরুদ্ধে ভীতি প্রদর্শন ও বলপ্রয়োগের অভিযোগ এনেছে। এইভাবে ন্যাশনাল কনফারেন্স সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে মন্ত্রীসভায় নির্বাচিত হয়। অনেকটা তৃণমূলের মতন আর কী? পাঠক খেয়াল রাখবেন বিরোধী পার্টিরা কিন্তু হিন্দু ছিল। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে প্রজা পরিষদ (কাশ্মীরি হিন্দুদের দল) নির্বাচন বয়কট করে। ২৭টা নির্বাচনী এলাকার মধ্যে নির্বাচনী অফিসাররা যারা সবাই ন্যাশনাল কনফারেন্সের মনোনীত ছিল তারা ২৪টা এলাকার মনোনয়নপত্র খারিজ করে দেয়। পরিষদকে স্রেফ ৩টে এলাকায় মনোনয়ন দেওয়া হয়। প্রতিবাদে প্রজা পরিষদ নির্বাচন বয়কট করে।

নির্বাচনে জেতার পর আবদুল্লার মন্ত্রীসভা চারটে বড় কাজ করে : (১) সংবিধান বানানো, (২) ডোগরা (হিন্দু) রাজাদের হঠানো, (৩) জমি সংস্কার , (৪) এক্সেশান। সংক্ষেপে বলা যায় আবদুল্লা জম্মু-কাশ্মীরের ভারতভুক্তির বিরোধিতা করেছিলেন ধর্মের অজুহাতে। তিনি মন্ত্রীসভায় বলেন যে— Certain tendencies have been asserting themselves in India' Sheikh Mohammad Abdullah told the Assembly, 'which may in future convert it into a religious state wherein the interests of the Muslims will be jeopardized. 'This would happen', he added, 'if a communal organization had a dominant hand in the Government, and Congress ideals of the equality of all communities were made to give way to religious intolerance.'

সূত্র : http://ikashmir.net/article370/chapter4.html [kashmiri pandit network]

অর্থাৎ আবদুল্লা ভারতীয় জনসঙ্ঘ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এবং হিন্দু মহাসভার সঙ্গে কথা বলছেন। তিনি মুসলমানদের স্বার্থের কথা বলছেন এবং ভাবছেন। পাঠক খেয়াল করবেন মন্ত্রীসভা কিন্তু হিন্দু সদস্য ছাড়াই চলছে। জম্মুর প্রজা পরিষদ কিন্তু এখানে নেই। সম্ভবত আবদুল্লা শ্যামাপ্রসাদের নামও জানতেন। শেষ পর্যন্ত তিনি স্বাধীন কাশ্মীরের দাবি তুললেন। স্বভাবতই হিন্দুরা বিশেষ করে প্রজা পরিষদ খুবই ক্ষুব্ধ হয়। হিন্দুদের বিরাট আন্দোলন শুরু হয়। ভারত সরকার প্রজা পরিষদের কাছে গোপালস্বামী আয়েঙ্গারের নেতৃত্বে আয়েঙ্গার কমিশন পাঠায়। সেই কমিশনের কাছে হিন্দুরা বলে :

The Hindus did not approve of the autonomous constitutional position, which the National Conference sought for the State, because such a loose relationship between the State and the Union would eventually lead to the cessation of the State from the Indian Union ;

The National Conference was working to establish dominance over

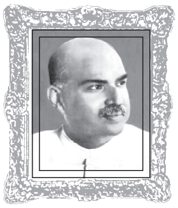

" The Country Owes an unlimited gratitude to Dr. Shyamaprasad Mukherjee for his Sacrifices for Kashmir."

R. C. Bhandari

36, Basemant,
8, Camac street
Kolkata–700017

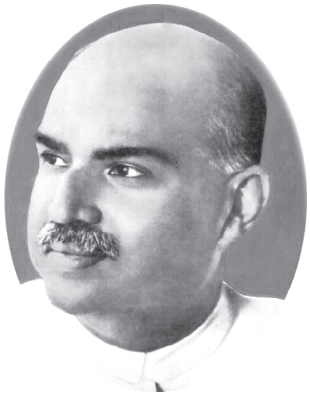

With Best Compliments :-

A well Wisher

Shree Gopal Jhunjhunwala

Gita Seva Trust

With Best Compliments of :-

MAITHAN ALLOYS LIMITED

P.O. - Kalyaneshwari - 713369
Dist - Burdwan
(west Bengal)

Ph : 0341-6464693 / 6464694,

Fax : 03412521303 / 2522996

Manufacturers of :

FERRO ALLOYS

With deepest Gratitude

Mr. Shailendra Bhandari

36, Basement 8,
Camac Street
Kolkata–700017

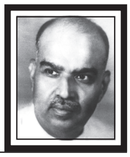

the Muslim majority over the government and the politics of the States, a million and quarter of people, constituting almost half of the population of the State, to a second rate citizenship and a life of servillance ;

The Interim Government had, right from its inception, vigorously reorganized property relations in the State to ensure Muslim dominance over its economic organization ;

The Interim Govenment had following a persistent policy of excluding the Hindus from the administrative organization of the State ;

The Interim Government had imposed an embargo on the admission of Hindus to educational institutions, grant of scholarships to them and their nomination to technical college inside and outside the State ; and

The Hindus and the other minorities favored the application of the Constitution of India to the State in its entirety.

সূত্র : http://ikashmir.net/article370/chapter4.html [kashmiri pandit network]

তাহলে অন্তবর্তী সরকার তথা আবদুল্লার মন্ত্রীসভা হিন্দুদের যে কীরকম দেখভাল করছিল সেটা স্পষ্ট বোঝা গেল। হিন্দুরা চেয়েছিল পুরো ভারতীয় সংবিধানের প্রয়োগ। সুতরাং আব্দুল্লার মন্ত্রীসভা কাশ্মীরকে স্বাধীন করতে চেয়েছিল মুসলমান আধিপত্যের জন্য। তারা হিন্দুবিদ্বেষী বলে বিখ্যাত ছিল। আব্দুল্লা শ্যামাপ্রসাদের নামও জানতেন। আর শ্যামাপ্রসাদ প্রজা পরিষদ আর হিন্দু সহায়ক সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এদের বাদ দিয়ে একতরফাভাবে স্বাধীন কাশ্মীরের পক্ষে রায় দেয় মন্ত্রীসভা তথা কাশ্মীরি মুসলমানদের মন্ত্রীসভা।

কনফারেন্সের নেতারা যা চেয়েছিলেন তা হলো—

The Jammu and Kashmir State was a Muslim majority State and in order to protect it's Muslim identity, it could not be brought within the political organization of India, which was dominantly Hindu ;

- The existing arrangements between the Maharaja and the Government of India could not form the basis of the constitutional organisation of the State or determine the future of the State's constitutional relations with the Dominion of India ;
- The future Constitution of the State and the constitutional relations between the State and the future federal organization of India would be determined by fresh agreements between the Interim Government and the Government of India ;
- The stipulation of the Instrument of Accession would be treated as redundant to the extent such stipulations brought the State within the jurisdiction of the Dominion of India ; (সূত্র : আর্টিকেল ৩৭০, লেখক মোহন কৃসেন তেং) এই সমস্ত সম্ভব হবে যদি ধারা ৩৭০ থাকে তাহলেই। সুতরাং ধারা ৩৭০-এর বিরোধিতা করে শ্যামাপ্রসাদ যে তার দু চোখের বিষ হয়ে উঠবেন এটা খুব স্বাভাবিক।

মন্ত্রীসভাই যে খুনি তার স্বপক্ষে আরো প্রমাণ :

(১) শ্যামাপ্রসাদ আব্দুল্লার পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিলেন ভারত সরকারের পুলিশের হাতে নয়। (২) আব্দুল্লার পুলিশ তাকে ভারত সরকারের হাতে তুলে দেয়নি। নিজেদের কাছে রেখেছিল। লখনপুরার গেস্ট হাউসে শ্যামাপ্রসাদকে রেখেছিল আব্দুল্লার পুলিশ। (৩) যে চিকিৎসক শ্যামাপ্রসাদের চিকিৎসা করেছিলেন, তিনিও আব্দুল্লা সরকারের। ভারত সরকারের নয়। (৪) আব্দুল্লা সরকার ভারত সরকারকে কিছুই জানায়নি। শ্যামাপ্রসাদের বিষয়টিকে পুরোপুরি অন্ধকারে রেখেছিল। ভুল খবর দিয়েছিল যে স্বাস্থ্যের কারণে শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু হয়েছে। (৫) শ্যামাপ্রসাদ জম্মু প্রজা পরিষদের ডাকে যাচ্ছিলেন। সেটা বোধহয় আব্দুল্লা জেনে গিয়েছিল। (৬) যে সময় উনি খুন হন সেই সময় শেখ আব্দুল্লা মন্ত্রী ছিলেন। তার পরের বছর ১৯৫৪ সালে আব্দুল্লাকে সরানো হয়েছিল। এটা পরিস্কার যে শ্যামাপ্রসাদকে শেখ আব্দুল্লার মন্ত্রীসভা খুন করিয়েছিল।

উপসংহার :

ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়া বড় প্রয়োজন। নিজের শত্রু-মিত্র চেনা খুব প্রয়োজন। কাশ্মীর মুসলমানদের ছিল বা আছে। তারাই যে আমাদের জাতির গর্ব শ্যামাপ্রসাদকে খুন করেছে এমনটা বুক ঠুকে বলবার হিম্মত এই দেশে কারোর হয়নি। সবাই নেহরুকে দোষ দিয়ে দায় সেরেছে। কিন্তু আসল খুনি চোখের আড়ালে রয়ে গেছে। আজ যেসব জঙ্গি কাশ্মীরিদের দেখতে পাই তারা শেখ আব্দুল্লাদের উত্তরসূরি। আমরা হিন্দুরা কোনো নতুন ব্যবহার তাদের কাছ থেকে পাইনি আর পাবো না। আমাদের ঠিক করতে হবে যে আমরা কী আরেকটা শ্যামাপ্রসাদকে হারাবো, না জম্মু কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা তুলে নেব। এটাই ঠিক করবে আগামী দিনে আর কোনো শ্যামাপ্রসাদের অকাল মৃত্যু হবে কি না।

(লেখক আইনজীবী)

PBOM

Office : 2269-3527, 2268-7127
Resi. : S. B. Bagaria-2283-2352
Cell : S. B. Bagaria - 98301 13354
Cell : Yogesh Poddar - 98303 04198
Cell : Manish Poddar - 98300 52686

BHARATI TEL UDYOG PVT. LTD.

(Mfrs. : MOHWA, COCONUT, SUNFLOWER, RICE BRAN SOL. OILS & D-OILED CAKES)

Regd. Office :

187, Rabindra Sarani, 2nd Floor, R. No. 74
Kolkata-700 007

Works :

Sainthia, Dist. : Birbhum (W.B.), Phone : (03462) 262239, 9434030090

With Best Compliments From :-

EAST INDIA TRANSPORT AGENCY

(A Unit of E.I.T.A. India Limited)

20B, Abdul Hamid Street
4th Foor
Kolkata - 700 069
Phone : Nos. 22483203, 22488036, 37
Fax No. 22483195
Email : eita.cal@eitain.com

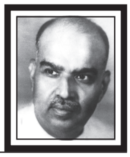

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে শ্যামাপ্রসাদের মতো রাজনৈতিক নেতার খুবই প্রয়োজন

মানস ঘোষ

একাত্তরের বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ আমি যখন 'কভার' করছি তখন প্রায়শই রাতে শোবার সময় একটা দুঃস্বপ্ন দেখতাম। সেটি ছিল এই রকম : দলে দলে আতঙ্কিত, নির্যাতিত ও ক্ষুধার্ত স্ত্রী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা বিরতিহীন সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো আমাদের সীমান্তে আছড়ে পড়ছে। নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে অনেকের দেহে খান সেনার সীমাহীন বর্বরতার দগদগে ঘা দেখে মাঝে মাঝে চমকে উঠতাম এবং ঘুম ভেঙ্গে যেত। প্রায় ৭০ বছর পর আজকাল আমি আমার সেই দুঃস্বপ্ন মাঝে মাঝে দেখি। এর কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করি কিন্তু কোনো সদর্থক সূত্র খুঁজে পাই না।

কিন্তু যে ভয়টি আজকাল আমার মনে বেশ ভালভাবে জাঁকিয়ে বসেছে, সেটিই দুঃস্বপ্নের কারণ বলে মনে হয়। আর সেটা হলো শেখ হাসিনার কিছু হলে আওয়ামি লীগের, সে দেশের সংখ্যালঘুদের এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের কী হবে? কেননা স্বাধীন ধর্মনিরপেক্ষ ও জাতীয়তাবাদী বাংলাদেশের অস্তিত্ব শেখ হাসিনার ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। তিনি না থাকলে বাংলাদেশের আদর্শগত অস্তিত্ব বিপদের সম্মুখীন হবে। সে দেশের পৌনে দু'কোটি হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এবং সাঁওতালি, মণিপুরি, হাজং, গারো, খাসি ও অন্যান্য জনজাতি গোষ্ঠীর লোকেরা এক চরম অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হবে। তাদের সঙ্গে সেকুলার মুসলমান সমাজের নাগরিকরাও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবেন। কারণ শেখ হাসিনা হলেন তাদের সকলের শেষ আশ্রয় ও আস্থার মূল কারণ। তাঁকে ঘিরেই তাঁরা এক অসাম্প্রদায়িক ও বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেন।

শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আছেন বলেই ভারতের বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা আবার ফিরে এসেছে এবং ওই অঞ্চলটি আবার উন্নয়নের পথ ধরে এগিয়ে চলেছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর নেতাদের গ্রেপ্তার করে শুধু ভারতের হাতে তিনি তুলে দিচ্ছেন না, খালেদা জিয়ার সময় বাংলাদেশে সরকারি মদতে যেসব গোষ্ঠীর গোপন ডেরা গড়ে উঠেছিল সেগুলোকে ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছেন।

শেখ হাসিনা না থাকলে সংখ্যালঘুদের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। তিনি যে শাসক দলের নেতৃত্বে দেন সেই আওয়ামি লিগের ভিত্তি তিনি। তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার ওপর ভিত্তি করেই আওয়ামি লিগ ক্ষমতায় আছে। ঠিক যেমনটি ছিল তাঁর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সময়। কিন্তু তাঁকে হত্যা করার পর আওয়ামি লিগ দলটি তাসের ঘরের মতো ধসে পড়ে।

তাদের এই বিশ্বাসঘাতকতা দেখে সংখ্যালঘুরা নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে এবং বেশ কয়েক লক্ষ হিন্দু চোরাপথে ভারতে প্রবেশ করে। এই সংখ্যালঘুরা ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর--- 'সব ধরনের ধর্মাবলম্বীরা বাংলাদেশে ফিরে যে যার নিজের ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করতে পারবে'— এই আশ্বাসের ওপর ভর করেই শরণার্থী ও ত্রাণ শিবির থেকে নিজেদের ভিটেমাটিতে ফিরে যায়। সেই বঙ্গবন্ধু যখন দলের ষড়যন্ত্রীদের শিকার হলেন, তখন তারা শাসকদলের ওপর আস্থা হারায়। শুধু সংখ্যালঘুরাই নয় বাংলাদেশের প্রথম সারির বুদ্ধিজীবীদের অনেকে যেমন শওকত ওসমানের মতো প্রথিতযশা সাহিত্যিক ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান ওই পালিয়ে আসা বুদ্ধিজীবীদের বেশ কয়েকজনকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলেন। জিয়াউর একটি চিরকুটে— 'তোকে হত্যা করা হবে'— হুমকির বার্তা লিখে পাঠান। যে কারণে শওকত ওসমানকে কলকাতায় পালিয়ে আসতে বাধ্য করা হয়। শওকত ভাই সেই চিরকুট আমায় দেখিয়েছিলেন। সেই চিরকুট জিয়াউরের খুব বিশ্বস্ত এক কর্নেল না ব্রিগেডিয়ার সই করে পাঠিয়েছিলেন। যাতে শওকত ভাই হুমকিটি গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করেন।

২০০১ সালে সংসদীয় নির্বাচনের সময় খালেদা জিয়াপন্থী ইসলামিক জোট সংখ্যালঘুদের বিশেষ করে হিন্দুদের নির্যাতন ও নিধন যজ্ঞ আরম্ভ করে। এই কারণ দেখিয়ে যে হিন্দুরা ইসলামি দলগুলোকে ভোট দেয় না।

এখন প্রশ্ন হলো, ২০০১-এর নির্বাচনে বাংলাদেশে যা ঘটেছিল তার পুনরাবৃত্তি কি আমরা সেদেশের ২০১৯-এর সংসদীয় নির্বাচনে দেখতে যাচ্ছি? কারণ খালেদা ও জামাতরা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য শেখ হাসিনার হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক ধসিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। আর সেটা করার অন্যতম উপায় হলো দেশের পৌনে দু' কোটি সংখ্যালঘুর নিঃশব্দে দেশ ত্যাগে বাধ্য করা। কারণ তারা সংসদের ৩০০টি আসনের মধ্যে অন্তত ৪২টি আসনে আওয়ামি লিগের জয় নিশ্চিত করে দেয়।

খালেদা জিয়ারা খুব ভালো করেই জানেন ২০১৯-এর নির্বাচনে শেখ হাসিনা আবার যদি পাঁচ বছরের জন্য ক্ষমতায় আসেন তাহলে তাঁরা ও তাঁদের রাজনৈতিক দল এমন এক বিশাল ধাক্কা খাবে যা তাঁদের সামলে ওঠা খুবই মুশকিল। ইতিমধ্যেই খালেদাপন্থী দলগুলোর নেতা-নেত্রীরা বয়সের ভারে ন্যুব্জ এবং দিশাহীন। সাংগঠনিক ভাবে তারা খুবই দুর্বল এবং প্রায় নেতৃত্বহীন। কিন্তু ধর্মের জিগির তুলে তারা নির্বাচনের আগে চাঙ্গা হয়ে ওঠে। তাদের আরও একটি অস্ত্র হলো সংখ্যালঘু নির্যাতন। সেটাকে পাখির চোখ করে তারা মুসলমান জঙ্গিদের প্রকাশ্যে মদত দিচ্ছে। এমনকী পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে

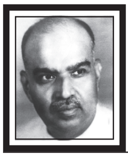

নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করেছে পশ্চিমবঙ্গে জেহাদি কার্যক্রম কার্যকর করার লক্ষ্যে।

এ পারের কিছু মুসলমান ধর্মগুরু তো প্রকাশ্যে ভারতে আরও একটি পাকিস্তান গড়ার জন্য জেহাদ ঘোষণা করেছে। এমনকী তারা ইসলামিক স্টেটকে প্রকাশ্যে সমর্থন জানাতে পিছুপা নয়। এই জেহাদের অংশ হিসেবে তারা পশ্চিমবঙ্গের বাংলাদেশ লাগোয়া সীমান্তবর্তী মুসলমান প্রধান জেলাগুলোর বিশেষ অঞ্চলগুলোয় অমুসলমান শূন্য করার কাজকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। অনেকটা কাশ্মীর উপত্যকা থেকে হিন্দু পণ্ডিতদের বিতাড়নের মতো।

প্রায় দু' বছর আগে মালদার কালিয়াচকে যে ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটে, যাতে স্থানীয় থানা, হিন্দুদের বাড়িঘর, দোকান, মন্দির ভেঙে চুরমার করে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়, তার লক্ষ্যও একই ছিল। এই সীমান্তবর্তী মহকুমা শহরে যে ছিটেফোঁটা হিন্দু আছে, তাদের বাধ্য করা সেখান থেকে ক্রমশ সরে যেতে। যাতে শহরটি হিন্দু শূন্য হয়। এবং হচ্ছেও তাই। ওই শহরের অনেক হিন্দু পরিবার মালদা জেলার অন্যান্য শহরে গিয়ে ঠাঁই নিয়েছে।

দুই পারের জামাতের লক্ষ্য হলো পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীন মুসলমান বাংলা বা মোগল বাংলা গঠন করা। অনেকটা ১৯৪৭-এর মতো। মুসলিম লিগের স্বাধীন অখণ্ডবঙ্গ গঠন করা। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল শেষ পর্যন্ত সেই মোগল বাংলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা।

দেশভাগের সাত দশক পরে একই এজেন্ডা নিয়ে বাংলাদেশের পাকপন্থী জামাতিরা এবং এই বঙ্গের তাদের দোসররা সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে নেমেছে। এক শ্রেণীর মুসলমান ধর্মগুরু এতটাই বেপরোয়া হয়েছে যে প্রকাশ্যে সাংবাদিক সম্মেলন করে বলছে তারা এই দেশে আরও একটি পাকিস্তান সৃষ্টি করবে ভারতের ২০ কোটি মুসলমানদের জন্য এবং তার জন্য মুসলমানরা জেহাদ অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধ শুরু করেছে।

কিন্তু সেই ধর্মগুরুর বিরুদ্ধে মমতা সরকার কোনো আইনি পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত থেকেছে। বরং মুসলমান ভোট পাওয়ার জন্য ওই ধর্মগুরুর অবিরাম তোষণ করে চলেছে। ওই ধর্মগুরু লাদেন, আলকায়দা, তালিবান এবং সর্বোপরি ইসলামিক স্টেটের কট্টর সমর্থক। ওই গুরু মুসলমান যুবকদের বলছেন লাদেনকে তাদের 'রোল মডেল' বানাতে। লাদেনকে যখন হত্যা করা হয় তখন ওই গুরু লাদেনের সমর্থনে এক মিছিল বের করে যা কলকাতার প্রাণকেন্দ্র প্রদক্ষিণ করে এবং ওই কুখ্যাত জঙ্গিকে শহিদ বলে আখ্যায়িত করে। ওই একই ধর্মগুরু তসলিমার মাথার দাম ৭০ লক্ষ টাকা ধার্য করে। এমনকী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গাড়ি থামিয়ে তার মুখে যে আলকাতরা লাগাতে পারবে তাকে সে ৫০ লক্ষ টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করবে। এমনটাও বলেন।

এই ধর্মগুরুর বিরুদ্ধে মমতা কোনো আইনি পদক্ষেপ নিতে অক্ষম। কারণ সে মমতার রাজনীতিকে প্রকাশ্যে সমর্থন করে। সে এমনও দাবি করে যে তার জন্যই মমতা আজ ক্ষমতায় এবং তার মসজিদে মমতা গেলে তাকে হিজাব পরিয়ে অভ্যর্থনা জানায়। ওই গুরুটি মমতার সভা-সমিতিতে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিতও থাকে।

কিন্তু চিন্তার কারণ হলো, বাংলাদেশের জামাতিরা ২০১৯-এর সংসদীয় নির্বাচনের আগে তাদের পশ্চিমবঙ্গের দোসরদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে একটা নব্য পাকিস্তান গড়ার লক্ষ্যে যদি বাংলাদেশের পৌনে দু'কোটি সংখ্যালঘু উচ্ছেদের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে তবে ওই বাংলাভাষী সংখ্যালঘুরা পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা ছাড়া ভারতের অন্য কোনো সীমান্তবর্তী ভারতীয় প্রদেশে আশ্রমের জন্য যাবে না, কারণ তারা সেখানে স্বাগত নয়। এমনকী পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায়ও তারা কতটা নিরাপদ সে ব্যাপারেও তারা সন্দিহান। কারণ যে জেলাগুলো মুসলমান অধ্যুষিত নয়, সেখানেও মুসলমানরা গড়ে সামগ্রিক জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ আর যাদের মনে ভারতকে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গকে দারুল ইসলামে পরিণত করার বীজ বপন করা হয়েছে। তারা কী বাংলাদেশ থেকে খেদানো সংখ্যালঘুদের বিশাল উপস্থিতি নির্দ্বিধায় মেনে নেবে?

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় আবু সৈয়দ আয়ুব ও বিচারপতি মাসুদের মতো খুবই কম সংখ্যক বাঙালি মুসলমান বুদ্ধিজীবী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেন। এখন তো এপারের অনেক মুসলমান নেতা আবুল হাশেম ও সুরাবর্দির মতো মুসলিম লিগ নেতাদের ভাষায় কথা বলছেন।

দুশ্চিন্তার কারণ হলো বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি হিন্দুদের হয়ে কথা বলার কোনো নেতা বা দল নেই। যারা এই প্রদেশে রাজনীতি করেন তাদের মুসলমান প্রীতি এতটাই প্রকট যে হিন্দু বাঙালিদের সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে তারা নির্লিপ্ত। বরং ওই নেতারা মুসলমাদের সমস্যা সমাধানে বেশি মনোযোগী। কারণ তা করলে রাজ্যে ২৫ শতাংশ মুসলমান ভোট এককাট্টা হয়ে তাদের ভোট বাক্সে পড়বে। অথচ হিন্দু বাঙালির ভোট জাতপাত ও বর্ণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এমন বিশ্রীভাবে ভাগাভাগি হয় যে তা ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে কোনো নির্ণায়ক ভূমিকা রাখে না।

এখন এ রাজ্যের রাজনীতিতে দরকার পশ্চিমবঙ্গের স্থপতি ও রক্ষাকর্তা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মতো এক বলিষ্ঠ নেতার যিনি পশ্চিমবঙ্গে আরও এক পাকিস্তান সৃষ্টির খেলা বানচাল করতে পারেন। মনে রাখতে হবে, তাঁরই নেতৃত্বে আন্দোলনের ফলে এপার বাংলার হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল পাকিস্তানের গ্রাস থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু বাঙালি হিন্দু তাঁকে হিন্দুত্ববাদী ঘোর সাম্প্রদায়িক বিশেষণে ভূষিত করেছে। উঠতে বসতে তাকে গালাগালি দেয়। বিশেষ করে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা শরণার্থীরা যাদের তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত ছিল। আজ যারা এখন নিজেদের ভারতীয় হিসেবে পরিচয় দেয় এবং এ রাজ্যে আশ্রয় পায় তা একমাত্র শ্যামাপ্রসাদের জন্য সম্ভব হয়েছিল। এখন শ্যামাপ্রসাদকে ওই সেকুলারবাদী হিন্দুরা ভারতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির স্রষ্টা বলে রাতদিন গালাগালি দেয়।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের রাজনীতিতে শ্যামাপ্রসাদের মাপের নেতা নেই এবং এ রাজ্যে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল থেকে সংখ্যালঘু বিতাড়নের প্রক্রিয়া শুরু করে তবে তারা আশ্রয় পাবে কোথায়? এই প্রশ্নটি ঘুরে ফিরে আমার মনকে আলোড়িত করে চলেছে।

গুজরাটিদের কাছে 'চতুর বানিয়া' সম্বোধন আদৌ অপমানজনক নয়

অতিথি কলম

আকর প্যাটেল

বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ গান্ধীজীকে 'চতুর বানিয়া' বলায় দেশের অন্যান্য অংশের মানুষ কেন এত খেপে গেলেন গুজরাটিরা বুঝে উঠতে পারছে না। আরে গান্ধী তো বানিয়া সম্প্রদায়েরই লোক ছিলেন! অমিত শাহ নিজেও তো তাই, তবে অমিত জৈন সম্প্রদায়ের বানিয়া আর গান্ধী ছিলেন বৈষ্ণবপন্থী বানিয়া। আমার মা প্রশ্ন করেছেন, অন্যান্য মানুষ কি 'চতুর' কথাটায় রেগে গেছে?

চতুর অর্থে কিছুটা ধূর্ত, সজাগ, বিচক্ষণও বোঝায়। হয়তো কথাটার মধ্যে ধূর্ততা বোঝাবার চেষ্টা বেশি আছে, কেউ কেউ ধরে নিচ্ছে। কিন্তু গুজরাটিতে বেনিয়াগিরি বা বেনিয়াস্বভাব কখনই তথাকথিত Shylock the Jew-এর মতো কোনো চরম বা নির্মম কৃপণতা বোঝাতে ব্যবহৃত হয় না। শাইলকের চরমপন্থার বদলে একথার মাধ্যমে কিছুটা সাবলীলতা বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে। সেই কারণে এই বিশেষত্বটির প্রশংসাই করা হয়। অন্যদের পক্ষে এর অনুকরণ করা শক্ত, কেননা এই বিশেষত্ব নিজস্ব সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে আসে।

বানিয়াদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য 'চতুরাই' সমেত আরও বহু গুণের সমাহার। এবং গুজরাটি সম্প্রদায়ের মধ্যে তা খুবই বিখ্যাত। গুজরাটি 'কহাবতকোষ' বা book of saying বইটির দু'টি পাতা ভরে আছে বানিয়াদের সম্পর্কে এক লাইনের নানা উদ্ধৃতিতে। এর মধ্যে সব থেকে ছোট উদ্ধৃতিটি 'বানিয়া মুচ নীচি' অর্থাৎ বানিয়াদের গোঁফের ডগা নিম্নমুখী থাকে। যুদ্ধবিগ্রহ করা সম্প্রদায়ের মতো গোঁফ কখনই চাড়া দেওয়া নয়। এই তিনটি শব্দের মধ্যেই একজন ব্যবসাদারের নৈতিক চরিত্রের আভাস রয়ে গেছে।

জগতে পর্যাপ্ত সম্মানপ্রাপ্তির মধ্যে বানিয়া কোনো জাগতিক লাভ দেখতে পায় না। তাদের কাছে যশের পেছনে ধাওয়া কেবল সময়েরই অপব্যয় মাত্র। এটা একটা যুগান্তকারী সাংস্কৃতিক শিক্ষা। একটি বীর-পূজারি প্রাচীন জাতির পক্ষে এই ধরনের দৃষ্টিকোণ একেবারেই পরিশীলিত নতুন কিছু যা তাদের আদৌ মনঃপূত নয়।

গুজরাটের বানিয়ারা মোট জনসংখ্যার মেরে কেটে ১ শতাংশ। কিন্তু তাদের সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ বিরাট। আমাদের সমস্ত প্রচলিত মূল্যবোধ ও প্রথা যেমন— শাকাহারী হওয়া, ব্যবসাদারী, অহিংসা, বৈষ্ণবীয় আচরণ, গোমাতার রক্ষা— এসবই বানিয়া সংস্কারের অন্তর্গত। অন্য যে উচ্চ সংস্কৃতি ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল চোখে পড়ে সেগুলি সবই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অঙ্গ। গুজরাটে এই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির কোনো আলাদা মর্যাদা নেই। গুজরাটে ব্রাহ্মণকে বাইরে থেকে আসা অভিবাসী বলা হয়। ব্রাহ্মণদের পদবি অর্থাৎ যোশী, ত্রিবেদী, উপাধ্যায়ের মধ্যেই তাঁরা কোথা থেকে এসেছেন তা ধরা থাকে।

বানিয়া সংস্কৃতি প্রবলভাবে বিদ্যমান বলেই সেনাবাহিনীতে গুজরাটিদের উপস্থিতি অতি নগণ্য। এই বিষয়টা আমার কাছে খুবই আনন্দদায়ক এবং বারবার না বলে পারি না। ২০১৬ সাল অবধি মোট অবসরপ্রাপ্ত সেনা সংখ্যা ২৪ লক্ষ ৪৭ হাজারের মধ্যে গুজরাটি ২৬ হাজার অর্থাৎ ১ শতাংশ। কিন্তু ভারতের জনসংখ্যার ৫ শতাংশ গুজরাটি। তাহলে বানিয়ারা কি কাপুরুষ? অবশ্যই নয়। গুজরাটিরা অন্যরকমের সাহসী। গুজরাটিরা খুব হিসেবপত্র করে জুয়া খেলায় অংশ নেয় সেটা বিশদে জানলে লড়াকু জাঠেরা আতঙ্কিত হয়ে পড়বে।

বানিয়াদের অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে পরিস্থিতির পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে ভারত প্রভূত উপকৃতই হয়েছে। ভারতের ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ভারতীয় রাজনীতি যখন মারাঠি ব্রাহ্মণ ও বাঙালিদের দ্বারা প্রবলভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সেই বিংশ শতাব্দীর শুরুতে, রাজনীতি ক্ষেত্রে পা ফেলেই তারা সমগ্র পরিসরটিকে দখল করে ফেলে। গান্ধী, জিন্না, প্যাটেল মারাঠি ও বাঙালিদের হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিক করে দিলেন। কিন্তু কীভাবে? সাংস্কৃতিক মানদণ্ডে বিচার করলে বলতে হবে--- চারিত্রিক নমনীয়তা, পরিবর্তনযোগ্যতা ও সর্বোপরি ক্ষেত্রবিশেষে নিজস্ব সম্মানের কথা না ভেবে, আবেগ বা ego দ্বারা চালিত না হয়ে পারস্পরিক মঙ্গল যাতে হয় সেই রাস্তা স্থির করতে দ্বিধা না করা। কথাটা শুনতে খুব সহজ মনে হলেও কাজে আদৌ তা নয়। পশ্চিমবঙ্গের মমতা ব্যানার্জী নাকি আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন অমিত শাহের কথা শুনে। কী করে তিনি গান্ধীকে বেনিয়া বললেন? এই মর্মে তিনি জ্ঞান দিয়েছেন, 'ভাষার ক্ষেত্রে আমাদের অনেক বেশি সংযমী ও সংবেদনশীল শব্দ ব্যবহার করা দরকার বিশেষ করে আমরা যখন জাতীয় মহাপুরুষদের সম্পর্কে বলছি'। হ্যাঁ, তিনি অবশ্যই অতি উচ্চ বাঙালি সংস্কৃতির অবস্থান থেকেই তাঁর মতামত দিয়েছেন যেখানে 'বেনিয়া' শব্দকে অত্যন্ত নীচু চোখে দেখা হয়।

With best Compliments from :

CASTRON TECHNOLOGIES LIMITED

Manufacturer of -

FERRO MANGANESE

SILICO MANGANESE

LOW PHOS FERRO MANGANESE

Regd. office :

14, Bentinck Street, 1st floor, Room No. 8
Kolkata - 700 001, West Bengal (India)
Phone : (91-33) 22624465

Head Office :

Yogamaya, Dhaiya, Post Nag Nagar
DHANBAD - 826 004, Jharkhand (India)
Phones : (91-326) 2207886, 2203390
Fax : (91-326) 2207455
E-mail : atul@castrontech.com

Works :

Phase- III/B-4, B-5, Bokaro Industrial Area
Balidih, Bokaro Steel City - 827 014
Jharkhand (India)
Phones : (91-6542) 253511
Fax : (91-6542) 253701

সত্যজিৎ রায়ের 'কাপুরুষ-মহাপুরুষ' ছবির মহাপুরুষ অবিশ্বাস্য রকমের উচ্চমার্গীয় গুল মারলেও আদতে ঠগ। তাকে কিন্তু লোকের খুব খারাপ লাগেনি। সত্যজিৎ রায় আসলে দেখাতে চেয়েছেন সাধুবাবার ঐশ্বরিক ক্ষমতা বলে একজন মাড়োয়ারি কীভাবে রাতারাতি অসৎভাবে বড়লোক হবার স্বপ্ন দেখছে। সেই বাঙালির হিসেবে 'মাড়োয়ারি বানিয়া'। জয়বাবা ফেলুনাথ গল্পে মগনলাল মেঘরাজকে একজন কুশ্রী বানিয়া হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। গোদা বাঙালির বেনে ইমেজের সঙ্গে এই বানিয়া খুব খাপ খায়। বেচারা অমিত শাহ! এই সব কুট বিষয়ে তাঁর কোনো আগাম আন্দাজই ছিল না, যখন তিনি নিছক গুজরাটি পরিভাষা অনুযায়ী নেহাতই হালকাভাবে গুজরাটের বানিয়া অনুষঙ্গটিকে হিন্দিতে বলেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে পূর্বে উল্লেখিত 'কহাবতকোষে' আধ পাতা প্যাটেলদের নিয়ে লেখা আছে। গুজরাটিরা কিন্তু একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সময় তাদের সম্প্রদায়ের ব্যাপারটা খুব মাথায় রাখে। সেই প্যাটেলরা এমনিতে সরল প্রকৃতির কিন্তু চট করে খেপে উঠতে পারে। গুজরাটি সম্প্রদায়কে পারস্পরিকভাবে খুবই স্টিরিও টাইপ হিসেবে বলা হয়। চারিত্রিক বিরাট ফারাক দৃশ্যমান হয় না। ওই গ্রন্থে এ নিয়ে দু' পাতা লেখা আছে যা থেকে জানা যায় যেখানে এক সম্প্রদায়ের লোকেরা একে অপরকে 'মিয়াভাই' সম্বোধন করে।

গান্ধী একই সঙ্গে একটি পদবি ও একটি পেশাগত পরিচয় (মুদি)। মোদী পদবিও তাই। বিখ্যাত মোদীর গুণাবলী বোঝাতে একটি বাক্য রয়েছে— আমি এটির অনুবাদ করব না। কেননা বিপদ আছে। আমার অবস্থাও ভুল বোঝাবুঝির ফলে অমিত শাহের মতো হয়ে যেতে পারে। কিন্তু যাঁরা মানুষটিকে চেনেন, জানেন তাঁরা এটি পড়লে অবাক হতে পারেন। গান্ধীর পরে নরেন্দ্র মোদী ভারতের সবচেয়ে বড় জনপ্রিয় নেতা। বাপু গান্ধী একজন উষ্ণ, সহজে বন্ধু হয়ে যেতে পারেন কিন্তু ভেতরে চিন্তারত একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বীকে অস্ত্রহীন করে দেওয়ার ক্ষমতা ও ইচ্ছে দু'টিই তাঁর আয়ত্তে ছিল। আমাদের প্রধানমন্ত্রী একজন সংযত কিছুটা মেরুকৃত মানুষ। যাঁরা তাঁর আদর্শ সম্পর্কে বিতৃষ্ণা জ্ঞাপন করেন তাদের জন্য কিন্তু মোদীর কোনো কম্প্রোমাইজ ফর্মুলা নেই। তিনি এতদিন ধরে যা ক্ষমাহীনভাবেই তিনি তাই। এখন পাঠকের কৌতূহল হতে পারে তাহলে মোদীদের সংস্কৃতি কী বলছে। গুজরাটিতে মোদী বলতে পাশের বাড়ির দোকানদার বোঝায়। অনেক সময়ই তাঁরা খুচরো ব্যবসায়ী যাঁরা নির্দিষ্ট দামে বেচা কেনা করে। আগে বলা কারবারি বেনিয়াদের মতো মোদীদের কিন্তু কোনো দরাদরি বা পরিবর্তনশীলতা নেই। আমার নিয়ম অনুযায়ীই তোমাকে চলতে হবে। পোষালে নেবে না হলে ছেড়ে দেবে। আপোশ নেই। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

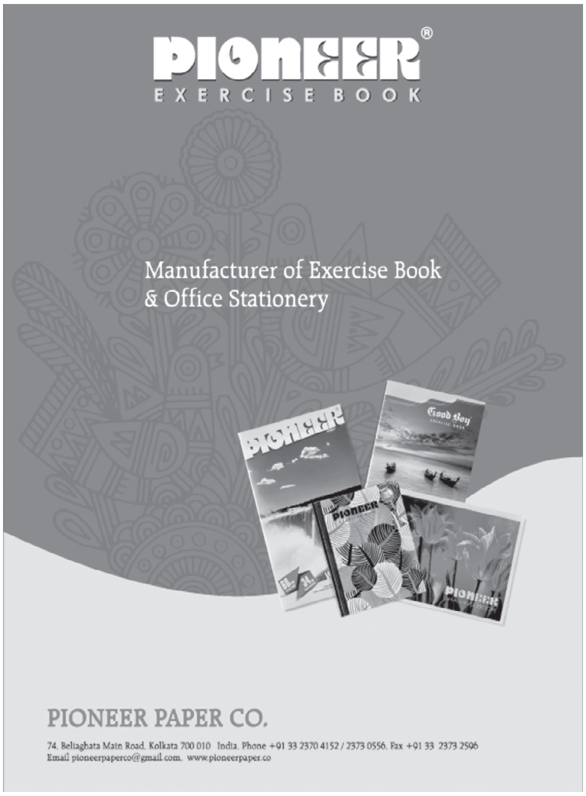

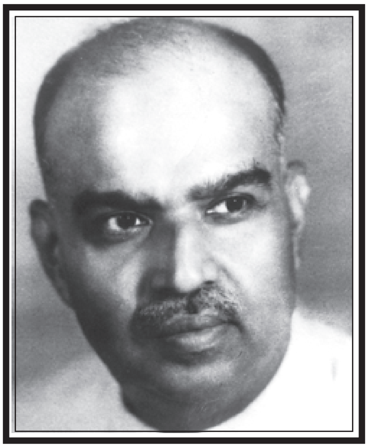

" The Country Owes an unlimited gratitude to Dr. Shyamaprasad Mukherjee for his Sacrifices for Kashmir."

A
Well
Wisher

(M.R.)

দার্জিলিং পাহাড়কে ভারত-বিরোধী আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র করা হচ্ছে

গণতান্ত্রিক ভারতে হিংসাশ্রয়ী আন্দোলনের স্থান নেই। সকল নাগরিকের সমান অধিকার। সবাই ভারতীয় নাগরিক। তাই স্রেফ ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক কারণে স্বাধীন রাজ্য চাই দাবি করাটা মানা যায় না। দেশের সংবিধান এমন অধিকার দেয়নি। আজাদ কাশ্মীর, স্বাধীন গোর্খাল্যান্ড, বড়োল্যান্ড ইত্যাদি দাবি করে যারা লোক খেপাচ্ছে তারা আদতে দেশের শত্রু। ভারত সরকারকেই দেশের শত্রুদের বিরুদ্ধে কী নীতি নিতে হবে, তার জন্য বিশেষ আইন বলবৎ করতে হবে। সাধারণভাবে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের। কিন্তু বিশেষ পরিস্থিতিতে এই দায়িত্ব যুগ্মভাবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে নিতে হবে। যেমনটা কাশ্মীরে ভারত সরকার নিয়েছে। সেখানে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের সঙ্গে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানরা আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করছেন। আজাদ কাশ্মীর একটা অলীক স্বপ্ন। যে স্বপ্ন সত্য হবে না। অন্তত ভারত নামক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রটি যতদিন থাকবে। ভারতের অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের মতোই জম্মু-কাশ্মীর একটি স্বশাসিত অঙ্গরাজ্য। সেখানে যারা আজাদির দাবি করছে তাদের কাছে জানতে চাই, সেই আজাদির ব্যাখ্যাটা কী? সুদূর দক্ষিণের তামিলনাড়ুর মানুষের যে আজাদি আছে তার থেকে বেশি আজাদি কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের আছে। বেশি আছে বলছি এই কারণে যে কাশ্মীরের মানুষ চাইলে তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের যে-কোনো রাজ্যে জমিবাড়ি, সম্পত্তি কিনতে পারেন। স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারেন। কিন্তু অন্য রাজ্যের বাসিন্দারা নিজ নামে কাশ্মীরে জমিবাড়ির মালিক হতে পারেন না। কাশ্মীরের মানুষকে ভরতুকিসহ নানা সুরক্ষার বলয় দিয়ে সামাজিক নিরাপত্তা দিয়েছে কেন্দ্র। তবু আজাদির স্লোগান চলছেই। মাঝে মাঝে মনে হয় এই বিশেষ স্ট্যাটাস দেওয়াটাই হয়তো অভিশাপ হয়েছে। কাশ্মীর ভারতের

গূঢ় পুরুষের কলম

প্যাম্পারর্ড চাইল্ড। বড়লোকের বখে যাওয়া সন্তান। জুলাই মাস থেকে সারা দেশের সব রাজ্য এক সমান কর (জি এস টি) লাগু হবে। শুধু কাশ্মীরে নয়। কেন? কেন্দ্রীয় সরকারকে জবাব দিতে হবে। কাশ্মীরকে বিচ্ছিন্ন করে রাখলে সেখানকার বিচ্ছিন্নতাবাদীদেরই মদত দেওয়া হবে।

এত কথা বলতে হলো এই কারণে, আমাদের ঘরের পাশে দার্জিলিং পাহাড়ে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠেছে। পাহাড়ের গোর্খারা স্বাধীন গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে হিংসাশ্রয়ী আন্দোলন শুরু করেছে। এই আন্দোলনকে ভোট-রাজনীতির অঙ্ক মাথায় রেখে প্রতিবেশী রাজ্য সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী পবন চামলিং বিধানসভায় গোর্খাল্যান্ডের দাবিকে সমর্থন করে প্রস্তাব পাশ করিয়েছেন। প্রতিবেশী স্বাধীন রাষ্ট্র নেপাল সরকারিভাবে কিছু না বললেও পরোক্ষভাবে বিমল গুরুংদের সব রকম সাহায্যের গোপন প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বোঝা যাচ্ছে যে নেপালের পিছনে আছে চীন এবং পাকিস্তানের উস্কানি। অর্থাৎ, আক্ষরিক অর্থেই পাহাড় এখন অগ্নিগর্ভ। ভারত বিরোধী আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র হয়ে উঠছে। তাই জ্বলন্ত কাশ্মীরের সঙ্গে অশান্ত দার্জিলিং পাহাড়ের তুলনা করাটা ভুল হবে না। গোর্খাল্যান্ডের স্লোগান দিয়ে ভারত বিরোধী চরেরা দার্জিলিং-সিকিমকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইছে।

এই আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করাটা মমতার রাজ্য সরকারের পক্ষে একা সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় সরকারেরও দায়িত্ব আছে। শুধু আধা সেনা পাঠিয়ে কর্তব্য শেষ করা যায় না। চাই সুস্পষ্ট নীতির ঘোষণা। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দমন করার দায়িত্ব শুধুই সেনার নয়। কেন্দ্রীয় সরকারেরও আছে। অগ্নিগর্ভ পাহাড়ের প্রকৃত উন্নয়ন প্রকল্পের দায়িত্ব রাজ্য সরকার নয়, কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া হোক। কারণ, উন্নয়নের কাজটা নিরপেক্ষভাবে হওয়া দরকার। তৃণমূলের রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষার কথা মাথায় রেখে কাজ করলে অশান্তির আগুন নিভবে না। মিরিকে যেভাবে তৃণমূল রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেছে তাতে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতারা শঙ্কিত। তাঁরা এই ঘটনাকে গোর্খাদের অস্তিত্বের লড়াই বলে মনে করছেন। তৃণমূল নেত্রী পশ্চিমবঙ্গকে দলের একচ্ছত্র জমিদারি করতে চাইছেন। এই কাজে তিনি সমতলে অনেকটাই সফল। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এনডিএ প্রার্থীকে চ্যালেঞ্জ করে তৃণমূল, কংগ্রেস এবং বামজোট একযোগে আসরে নেমেছে। এই আসরে তাঁদের খ্যামটা নাচের শেষে ন্যাংটা হয়ে ফিরতে হবে তা বলাবাহুল্য। তবে বঙ্গবাসীর কাছে প্রমাণ হয়ে গেল যে কংগ্রেস এবং সিপিএম এখন মমতার অনুগত বন্ধু। বিরোধী দল নয়। এইভাবে চললে আগামী লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস এবং সিপিএম এই রাজ্যে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাবে। ∎

MAKE IN INDIA

रेल बढ़े देश बढ़े
rail badhe desh badhe

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

Swachh Rail - Swachh Bharat

LITTERING/SPITTING STRICTLY PROHIBITED IN TRAINS/PLATFORMS/RAILWAY PREMISES

Spitting Prohibited

Washing Utensils Prohibited

Littering Prohibited

Fine can be up to
₹ 500/-

Please do not :

- Spit or throw or deposit litter in Railway premises. Use spittoon and litter bins.
- Cook, bathe, urinate, defecate, feed animals or birds, repair or wash cycle/vehicles, wash utensils or clothes.
- Paste or put posters, write, draw or scribble on the walls of the Railway stations and in the Railway compartment/carriage.
- Do not use train toilets at stations.

Prohibition of activities affecting cleanliness and hygiene in the Railway premises under Railways Act, 1989 and Indian Railways Rules-2012 penalties will be imposed on contravention of these rules.

Any violation of the Rule will entail fine

Please help us to keep Railway premises, stations & coaches clean

भारतीय रेल • INDIAN RAILWAYS

Eastern Railway
Striving for a cleaner environment

EXPRESSION

Follow us on @easternrailway @www.er.indianrailways.gov.in Like us on easternrail

কালো মোদী, সাদা টাকা

মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূলনেত্রী

দিদি আপনার দুটো পরিচয় দিয়েই সম্বোধন করলাম। কারণ, আপনার দুটো পরিচয় গুলিয়ে যাচ্ছে। আপনি নিজেও মনে হয় গুলিয়ে ফেলেন। এই যেমন দার্জিলিংয়ে গিয়ে রাজনৈতিক আর প্রশাসক মমতাকে মিশিয়ে ফেলে নাকানি চোবানি খাচ্ছেন। যাই হোক, কালোটাকা নিয়ে নোট বাতিলের পরে আপনি অনেক গাল পেড়েছেন প্রধানমন্ত্রীকে। দিল্লি দখলের হুমকিও দিয়ে রেখেছেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে বড় বড় আওয়াজ তুলে এখন আপনার মুখে কুলুপ। বেশ করেছেন। হেরো পক্ষের হয়ে গলাবাজির কোনো মানে হয় না।

এসব বলতে আপনার এই দুঃসময়ে চিঠি লিখতে বসিনি। বরং দুটি খবর আপনাকে জানাতে চাই। কালো মোদীর সাদা টাকা নীতি সম্পর্কে আপনার জ্ঞানচক্ষু খোলাও আমার কাজ নয়। আপনি সবই জানেন, তবু জানাতে ইচ্ছে করছে। জানেন কি কলকাতা পুরসভায় যাঁরা নোট বাতিলের পরে সব কর মিটিয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের বাড়িতে ইতিমধ্যেই আয়করের নোটিশ গিয়েছে?

গত বছরের ৮ নভেম্বর আচমকা ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিল করেন প্রধানমন্ত্রী। নোটবাতিল পর্বের ৫০ দিন পার করে ৩১ ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটা একটা অবিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার যে আয়করের হিসেব দাখিলের হিসেব অনুযায়ী, দেশের মাত্র ২৪ লাখ মানুষ বছরে ১০ লাখ টাকার উপরে আয় করেন। কেন্দ্র আরও একটি হিসেবে দেখেছে, দেশে করযোগ্য আয় থাকা সত্ত্বেও ৬৮ লাখ মানুষ আয়কর দেন না। এবার সেই নাগরিকদের চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়েছে। মোদী এই ঘোষণা করার পরে কালোটাকা উদ্ধার নিয়ে আয়কর দপ্তর তৎপরতা বাড়ায়। আর তার ফল মিলতে চলেছে।

নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছিলেন, দেশের ৬৮ লাখ মানুষ আয়কর দেন না। আর সদ্য শেষ হওয়া আর্থিক বছরের হিসেব বলছে, দেশে নতুন করদাতার সংখ্যা ৯৫ লাখ। অর্থাৎ এতদিন আয়কর রিটার্ন দাখিল করতেন না এমন ৯৫ লাখ মানুষ এবার রিটার্ন জমা দিয়েছেন। ২০১৬ আর্থিক বর্ষে ২২ শতাংশ আয়কর দাতা বেড়েছে আগের বছরের তুলনায়। মোট আয়কর রিটার্ন দাখিল হয়েছে ৫ কোটি ২৮ লাখ।

আয়কর দপ্তর সূত্রে আগেই দাবি করা হয়েছে যে আরও বড় সাফল্য মিলবে। ইতিমধ্যেই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুল পরিমাণে কালোটাকা উদ্ধার হয়েছে। এছাড়া নোট বাতিল পর্বে বেহিসেবি ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট জমা করা হয়েছে এমন ১৮ লাখ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের হদিশ মিলেছে। তাদের ধরতে এখন 'অপারেশন ক্লিন মানি' অভিযান চালাচ্ছে আয়কর দপ্তর।

নোট বাতিল কোনও কাজে লাগবে না বলে আপনার মতো যাঁরা সমালোচনা করেছিলেন, নোট বাতিল দেশের অর্থনীতিকে দুর্বল করবে বলে যাঁরা বিরোধিতা করেছিলেন তাঁদের জবাব দেওয়ার মতো অস্ত্র পেয়ে গিয়েছে বিজেপি সরকার। কারণ, করদাতা বৃদ্ধি মানে দেশের কোষাগারে তার বড় প্রভাব পড়বে।

এবার শুনুন অন্য কাহিনি। বিদেশের কালোটাকা নিয়ে স্বাধীনতার পরে এত বড় জয় ভারত আগে পায়নি। স্যুইস ব্যাঙ্কে গোপনে টাকা জমানোর দিন শেষ হতে চলেছে। এখন যাঁদের টাকা গচ্ছিত রয়েছে তাঁদের তথ্যও এবার ভারত সরকারের হাতে চলে আসবে খুব সহজে। লোকসভা নির্বাচনের আগে কালোটাকা উদ্ধারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। জয়ের পরেও বারবার বিদেশের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত কালোটাকা উদ্ধারের কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবার সেই দিন খুব কাছেই।

সুইস সরকার ভারতের জন্য এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইউরোপের সর্বোচ্চ এই কাউন্সিল খুব শীঘ্রই তথ্য আদানপ্রদানের সঠিক দিন তারিখ জানিয়ে দেবে। ভারতের কাছে তথা মোদী সরকারের কাছে এটা অবশ্যই বড় সাফল্য। দীর্ঘদিন ধরে বিদেশের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত কালোটাকা উদ্ধার নিয়ে দেশের রাজনীতি সরগরম হয়েছে। নোট বাতিলের পরে বিদেশের ব্যাঙ্কে থাকা কালোটাকা উদ্ধার নিয়ে সরকারের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তোলেন মমতা দিদি আপনি। এবার সেই সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে মোদী সরকার।

দীর্ঘদিন ধরেই মোদী সরকার এই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দুই দেশের সরকারের মধ্যে একের পর এক বৈঠক হয়েছে। অবশেষে সুফল পেতে চলেছে ভারত। এক কথায়, সুইস ব্যাঙ্কের গোপন ভল্টের চাবি এখন মোদী সরকারের হাতে। এবার সবারই অ্যাকাউন্টের তথ্য পাওয়ার চাবিই চলে এল কেন্দ্রের হাতে।

তাই সাবধান। আপনার দলের এবং বন্ধু দলের নেতাদের সতর্ক করে দিন। মানে যাঁদের কালোটাকা বিদেশে আছে। আর কান টানলে মাথাতো আসবেই।

—সুন্দর মৌলিক

Krishna Chandra Dutta (Cookme) Pvt. Ltd.
ডাটা
গুঁড়ো মশলা
'থাকে যদি ডাটা,
জমে যায় রান্নাটা'
কেনার সময় অবশ্যই
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী)
প্রাইভেট লিমিটেড
নাম দেখে তবেই কিনবেন
DUTA
TURMERIC POWDER
CUMIN POWDER
Curry Powder
RED CHILLI POWDER
CORIANDER POWDER
Pure Indian Spices
fssai
Lic. No.
12812019005087
রেজিস্টার্ড অফিস ঃ ২০৭ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কোলকাতা ৭০০০০৭
দূরভাষ ঃ (০৩৩) ২২৫৯ ০৮৬৩/১৭৯৬/৪১১২/৫৫৪৮
email : dutaspice@gmail.com
website : www.dutaspices.com

Ganpati Sugar Industries Limited

Head Office
20B, Abdul Hamid Street
4th Floor, Kolkata - 700 069
Phone : 033-22483203
Fax : 033-22483195

Administrative Office
8-2-438/5, Road No. 4
BANJARA HILLS
Hyderabad - 500 034
040-2335215/213

Works
Village - Fasalwadi
Mandal Sangareddy
District - Medek
Andhra Pradesh

With Best Compliments

From :-

A Well Wisher

Jaideep

Halwasiya

bharat

Litho

puts life in printing

98/4, S. N. Banerjee Road

Kolkata - 700 014

(India)

Phone : +91 33 22657862, 22493855

Fax : + 91 22651063

bharatlitho@gmail.com

surendradhote@gmail.com,

www.bharatlitho.com

With Best Wishes from :

JHUNJHUNWALA JANKALYAN

TRUST

With best Compliments from :

Manufacturer of ***Bulk Drugs & Chemicals***

Kothari Phytochemicals
&
Industries Limited

C-4, Gillander House, 8, N.S. Road, Kolkata - 700 001

Works at.

PHYTOCHEMICALS DIVISON - MADURAI

Vill- Nagari. P.O. - Thanichchiyam

Dist.- Madurai

Pin - 625 221, Tamil Nadu, India

CLARO INDIA DIVISON

B-7, Sipcot Industrial Complex, Gummidipoondi

Pin - 601 201, Tamil Nadu, India

SOUTHERN SYNTHETICS DIVISON

No. 14, Sipcot Industrial Complex, Ranipet

Pin - 632 403, Tamil Nadu, India

সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না

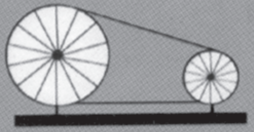

স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম

চির পরিচিত

দুলালের®

তালমিছরি

আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।

সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান —– দারুণ কাজ দেবে।

ভারত সরকারের R ® চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন

দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী

দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. KOL RMS/048/2016-18
3 July - 2017 - Rs. 10.00, Shyamaprasad Sankhya

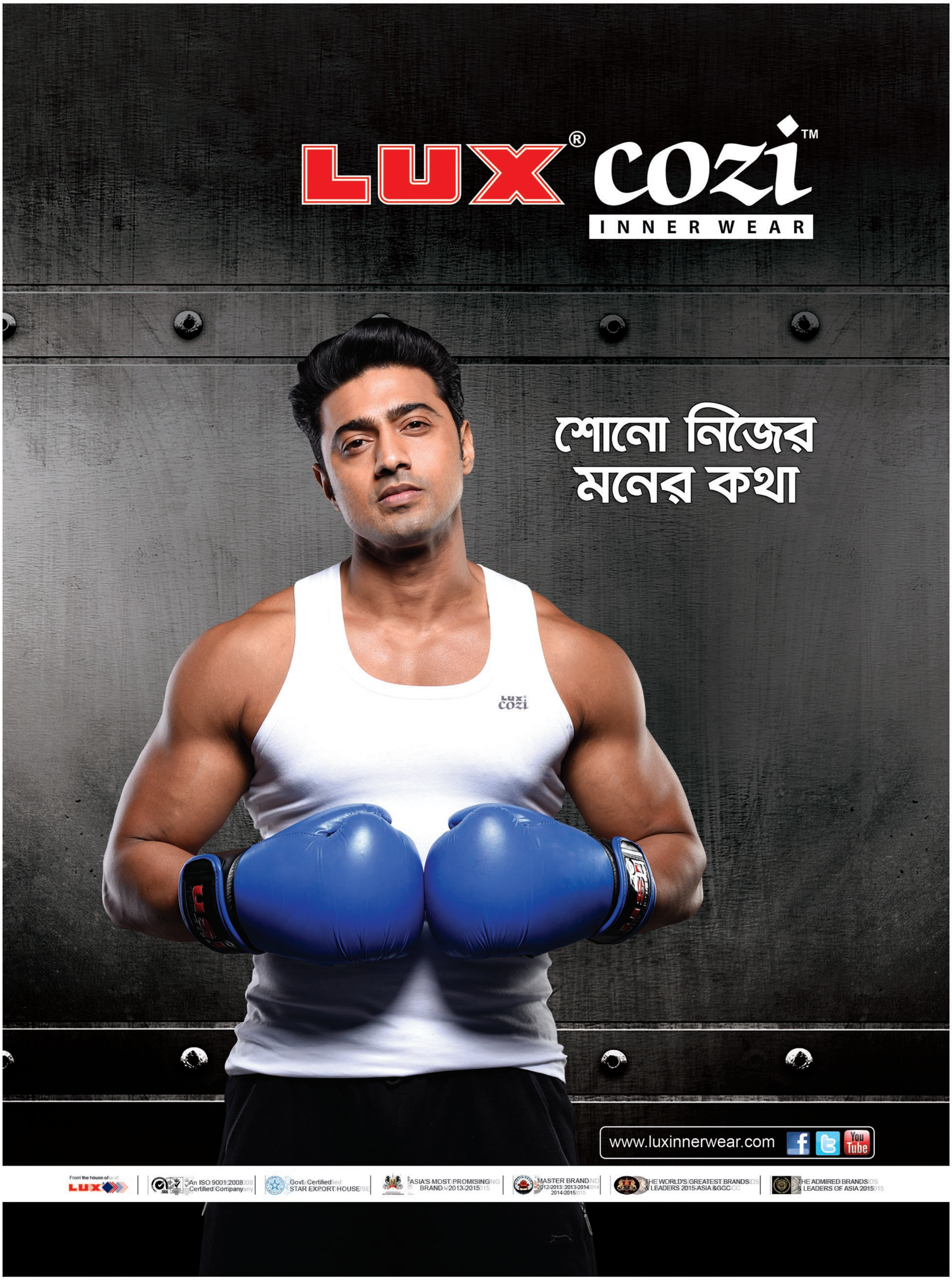

Published and Printed by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6.
Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. ।। দাম ১০৲ টাকা।।